গল্পমালা



শ্রীকালিদাস রায়

কবিশেখর

গল্পমালা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গল্পমালা

কবিশেখর কালিদাস রায়
'দেশিকোত্তম'

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
পি· ঘোষ
কলিকাতা-৯

নূতন সংস্করণ—১৯৮৯

মূল্য—আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমথুরা মোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

জালিম সিংহের সাহস



গিরিয়ার রণক্ষেত্র। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—বিজয়ীদের দল জয়ধ্বনি করিতেছে—পরাজিত দলের লোক সকলেই পালাইয়াছে। বিজয়ী সৈনিকরা তাহাদের পক্ষের আহতদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া তুলিয়া শিবিরে লইয়া যাইতেছে—আর শত্রুপক্ষের আহতদের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। এই হতাহতপূর্ণ রণক্ষেত্রে একটি দ্বাদশবর্ষের বালক মুক্ত তরবারি হস্তে একটি মৃতদেশের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল হাঁকিতেছে—খবরদার! খবরদার!!

বিজয়ী সৈনিকরা অবাক হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল ছেলেটা ত' দেখছি কাফেরের বাচ্চা। দাও ওকে শেষ ক'রে।

একজন বৃদ্ধ সৈনিক ছেলেটিকে বলিল—"তুমি এখানে কেন?"

বালক—"আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে এসেছিলাম।"

বৃদ্ধ সৈনিক—"তুমি আবার যুদ্ধ করবে কি? নেহাৎ ছেলেমানুষ। তোমার বাবার যেমন বুদ্ধি। তোমার বাবা বুঝি পালিয়েছে?"

বালক—"আমার বাবা ভীরু কাপুরুষ ন'ন। তিনি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন—তাঁর মৃতদেহ আমি আগলাচ্ছি!"

বৃদ্ধ সৈনিক—"যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহ আবার কে আগলায়? এই ত' হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে আছে—তাদের কে আগলাচ্ছে?"

বালক—"আমি বাবার দেহের সংকার করতে চাই। তাঁর দেহের উপর দিয়ে যাতে তোমরা ঘোড়া ছুটিয়ে না যাও, যাতে তাঁর মৃতদেহ তোমরা পা দিয়ে না মাড়াও সেজন্য পাহারা দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ সৈনিক—"নির্বোধ বালক, কে তোমার বাবার মৃতদেহের সংকার করবে? আমরা মুসলমান, আমরা সব মৃতদেহকে একসঙ্গে গোর দেব। হিন্দুর মৃতদেহের সংকার আমাদের দ্বারা তো হবে না। তুমিও মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

বালক—"যদি হিন্দুর সাহায্য না পাই—আমি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাব গিরিয়া গ্রামের মধ্যে।"

এমন সময় একজন বীরপুরুষ সে দিকে আসিলেন। তাঁহার অনুচরদের হাতে বিজয় পতাকা উড়িতেছে। অন্যান্য সৈনিকরা সভয়ে পথ ছাড়িয়া সেলাম করিয়া দুই পাশে দাঁড়াইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বালক এখানে কেন? কি চায় সে?"

বৃদ্ধ সৈনিকটি বলিল—"ও চায় ওর পিতার মৃতদেহের সংকার। যাতে ঐ মৃতদেহের উপর দিয়া সৈন্যরা চলাচল না করে, যাতে আমরা কেউ স্পর্শ না করি সেজন্য ছেলেটি পাহারা দিচ্ছে।"

বীরপুরুষ ছেলেটিকে বলিলেন—"বালক, তোমার পিতৃভক্তি, তোমার বীরত্বের আমি তারিফ করছি। আমি হিন্দু সৈনিকদের দিয়ে গঙ্গাতীরে তোমার বাবার মৃতদেহ বহন করাচ্ছি এবং সংকারের ব্যবস্থা করাচ্ছি। তুমি সঙ্গে যাও। তুমি সংকারের সব কাজ কর গিয়ে। আমিই আলিবর্দি খাঁ। তোমার বাড়ী কোথা—কি জাতির লোক তুমি?"

বালক সেলাম করিয়া উত্তর করিল—"আমরা রাজপুত, আমাদের বাড়ী মুর্শিদাবাদে।"

আলিবর্দি খাঁ বলিলেন—"হিন্দু সৈনিকরা তোমাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে তোমার মার কাছে পৌঁছে দেবে। তোমার বাবার নাম কি তাদের বোলো।"

বালক—"আমার বাবার নাম বিজয় সিংহ, আমার নাম জালিম।"

আলিবর্দি খাঁ—"ওঃ! তুমি সরফরাজ খাঁর সেনাপতি মহাবীর বিজয় সিংহের পুত্র—তাই তোমার এত তেজস্বিতা। তুমি তোমার বাবার মতই বীর হবে। আজকের যুদ্ধই তো বিজয় সিংহের সঙ্গে—সরফরাজের দক্ষিণ হস্তই ত' ছিল বিজয় সিংহ। তার মত বীর যোদ্ধা আমার একটিও নেই।"

আলিবর্দি খাঁ নিজের সৈন্যদের বলিলেন—তোমরা সকলে এই বীরপুরুষের মৃতদেহকে সম্মান দেখাবার জন্য গঙ্গাতীর পর্যন্ত কুচ্‌কাওয়াজ ক'রে যাও।

সরফরাজ খাঁ নবাব হইয়া ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া থাকিত। রাজত্ব চালাইতেন হাজি মহম্মদ (আলিবর্দির ভ্রাতা) ও আলম চাঁদ জগৎ শেঠ। সরফরাজ ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধত, ইহাদিগকে কেবলই অপমানিত করিতেন। সরফরাজের রাজত্ব অসহ্য হওয়ায় ইহারা দিল্লীতে দরবার করিয়া বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দি খাঁর নামে সুবেদারি সনন্দ আনান। এই সনন্দ লইয়া আলিবর্দি খাঁ পাটনা হইতে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার প্রান্তরে তাঁহার সম্মুখীন হ'ন। বিজয় সিংহ ছিলেন সরফরাজের সেনাপতি। বিজয় সিংহ অসীম বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার বালক পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।



ভাগ্যের খেলা

গ্রামের নাম বাসুদেবপুর, পদ্মাতীর হতে দক্ষিণদিকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। এক সময়ে গ্রামে বহু লোকই বাস করত, গ্রামখানি রীতিমত গণ্ডগ্রামই ছিল। পদ্মার ভাঙ্গন গ্রামের দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল, সেজন্য বহু লোকই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখন চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘরের বেশী লোক নেই। তাদের বেশির ভাগই জেলে-মালো, পাট চাষী মুসলমান ও নমঃশূদ্র।

গাঁয়ের মধ্যে একঘর মাত্র বামুন ছিল—একঘর ঠিক বলা যায় না—একজনই বলতে হয়, কারণ রাধাবিনোদ গোঁসাইয়ের স্ত্রী-পুত্র কেউ ছিল না, ছিল একটি মাত্র মেয়ে। সে মেয়ের বয়স দশ বছর। বিয়ে হয়ে গেছে। সে তার স্বামীর কাছে থাকে ডিব্রুগড়ে। রাধাবিনোদ ছিল গাঁয়ের দাদাঠাকুর। তাছাড়া রাধাবিনোদের দু'চার ঘর শিষ্যসেবক ছিল পূর্ববঙ্গের দিকে। একলার পেট তাতেই বেশ চ'লে যেত।

এটা ১৩০১ সালের কথা। শ্রাবণ মাসে রাধাবিনোদ শিষ্য বাড়ী চ'লে গিয়েছিল। এই সময়ই তার শিষ্য বাড়ী বেড়ানোর সময়—ঠিক পূজোর আগে সে ফিরে আসত, সারা বছর আর বেরুত না। গত বছর গাঁয়ের দক্ষিণদিক দিয়ে গাঁখানি বেড়ে একটা ফাটল দেখা দিয়েছিল—তাতে ভয় পেয়ে কয়েক ঘর গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু কয়েকদিন পরে তা বুজে যায়। লোকে আবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করতে থাকে। রাধাবিনোদ যখন গাঁ ছেড়ে শিষ্যবাড়ী যায়, তখন পদ্মার রোখ একেবারেই গাঁয়ের দিকে ছিল না। যাবার সময় সে গাঁয়ের লোকদের ব'লে যায়,—এবার আর কোন ভয় নেই। এবার গাঁয়ের উপর পদ্মার কোন রাগ-রোষ নেই।

বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যখন বোধনের সানাই বাজছে, তখন রাধাবিনোদ ফিরে এল। ফিরে এসে সে কি দেখলে? দেখলে গাঁয়ের চিহ্নমাত্র নেই; একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। গাঁয়ে একমাত্র রাধাবিনোদেরই পাকা একতলা দু'খানা ঘর ছিল। এ পাকা ঘর রাধাবিনোদের পিতামহের তৈরী।

ব্রাহ্মণ দেখল যেখানে তার বাড়ী ছিল সেখানে পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ, তার ওপর দিয়ে বড় বড় নৌকা পাল তুলে চলেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রাহ্মণ ফিরল।

তারপর তিন চার মাস এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কাটল। সম্বলও এদিকে ফুরিয়ে এল। শেষে সে নারায়ণপুর গ্রামে আশ্রয় নিল। এই গ্রাম বাসুদেবপুর হতে ত্রিশ ক্রোশ পূর্বদিকে। নারায়ণপুরও পদ্মারই তীরে। —তবে পদ্মা হতে চার-পাঁচ মাইল দূরে। এই গাঁয়ে রাধাবিনোদের পিতামহের এক শিষ্যা ছিল। এই শিষ্যার বাড়ীতে রাধাবিনোদ কয়েকদিন ধরে বাস করতে লাগল। এই বৃদ্ধার ত্রিসংসারে কেউ ছিল না। বৃদ্ধা বলল—ঠাকুর, আমি যে ক'দিন বেঁচে আছি এখানেই থাকুন, আমার কাল হওয়ার পর এ বাড়ী আপনারই হবে। ব্রাহ্মণ কোন উত্তর না দিয়ে ঐখানে থাকতে লাগল।

একদিন সে গাঁয়ের ছোট বাজারের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় হারাধন ময়রার দোকানে কিছু জলযোগের জন্য উঠল। ময়রা ব্রাহ্মণকে আদর ক'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাল। ব্রাহ্মণ ঝাঁপের ঝরোকার ফাঁক দিয়ে দেখল—উঠানে দু'খানা পুরানো কাঠের কড়ি

প'ড়ে পাছে। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে ছটোকে পরীক্ষা ক'রে আবার বসল। ময়রাকে জিজ্ঞাসা করল—"বাপু, তুমি এই কড়ি-বরগা পেলে কোথা ?"

ময়রা বলল—"ঠাকুর ওছটো আমি কার্তিক মাসে এক মাঝির কাছে কিনেছি। ইচ্ছে আছে দোকান ঘরটা পাকা করব।"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"তা বেশ, ওগুলো ছিল আমারই ঘরের।"

ময়রা—"কি ক'রে বুঝলেন ?"

ব্রাহ্মণ—"গত শ্রাবণ মাসে বাসুদেবপুর গাঁ-খানা পদ্মার ভাঙনে ভেঙে গেছে। সেই গাঁয়ে আমার বাড়ী ছিল। ঐ যে কড়ির গায়ে দেখছ 'রা-গো-গো' লেখা। ঐ 'রা-গো-গো' আমার পিতামহ রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর নাম।"

ময়রা—"তা'ত জানি না ঠাকুর। আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি। আর কোন প্রমাণ আছে।"

ব্রাহ্মণ—"আছে। ঐ যে কড়িখানায় একটা কাঠের টুকরা আঁটা রয়েছে, ঐ টুকরাটা খুল্‌লে পঞ্চাশ খানা মোহর পাবে।"

ময়রা—"বলেন কি ?"

ব্রাহ্মণ—"বল্‌ব আবার কি ? একখানা করাত আনাও। আর সবাইকে সরিয়ে দাও।"

ময়রা এক ছুতোরের কাছ হতে একখানা করাত আনিয়ে কড়ির চিহ্নিত জায়গাটি কোন প্রকারে চিরে ফেলল। সত্য সত্যই পঞ্চাশখানা মোহর তার ভিতর হতে বেরুল। ময়রা ত' অবাক্।

ব্রাহ্মণ বলল—"এক ধনী বিধবা শিষ্যা মৃত্যুর আগে আমার বাবাকে ঐ পঞ্চাশখানা মোহর দিয়ে গিয়েছিলেন। ডাকাতের ভয়ে বাবা সে মোহর মেঝেতে পুঁতে রাখতে সাহস করেন নি। শেষে ঐ কড়ির মধ্যে ঐভাবে রেখেছিলেন। ব'লে গিয়েছিলেন,—নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ঐ মোহর খরচ করোনা। আমার

কোনদিন কোন প্রয়োজন হয়নি—সেজন্য মোহর যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় আছে।"

ময়রা ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো নিয়ে বলল—"ঠাকুর, আপনার মোহর আপনি নিন্। কাঠগুলো আমি কিনেছি, ওগুলো আমার থাক্। মোহর আমি কিনিনি,—ও মোহর আপনারই।"

ব্রাহ্মণ বলল—"না হারাধন, ভগবান তোমাকে ও মোহর দিয়েছেন,—আমার ওতে কোন অধিকার নেই। ভগবান যা কেড়ে নিয়েছেন, তা আমি আর নিতে পারি না।"

ময়রা ব্রাহ্মণের পা ধ'রে কত সাধাসাধি করল, ব্রাহ্মণ কিছুতেই সম্মত হ'ল না।

তিন চারদিন অতীত হ'ল। ব্রাহ্মণ দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, প্রত্যহই সে এই পথ দিয়ে স্নান ক'রে যেত। ময়রা তাকে ডেকে নিয়ে দোকানে বসাল এবং কিছু জলযোগ করাল। তারপর আবার মোহরগুলো নেওয়ার প্রস্তাব করল। ব্রাহ্মণ কিছুতেই রাজী হ'ল না।

তখন ময়রা বলল—"আচ্ছা, আপনাকে কিছু মিষ্টান্ন দিই। দয়া ক'রে বাড়ী নিয়ে যান।"

ব্রাহ্মণ তাতে রাজী হ'ল। ময়রা পঞ্চাশটি সন্দেশ একটি চ্যাঙারিতে ক'রে ব্রাহ্মণের হাতে দিল।

ব্রাহ্মণ চ্যাঙারি হাতে ক'রে বাসায় ফিরে বৃদ্ধাকে গিয়ে বলল—"এ মিঠাই আপনি খাবেন। এ মিঠাই আমি কিনিনি, একজন ময়রা আমাকে দিয়েছে।"

বৃদ্ধা বলল—"আমার তো আজ একাদশী বাবা। তুমি আজ দু'চারটা খাও, কাল বাকীগুলো খেও।"

ব্রাহ্মণ—"আমি এইমাত্র পেট ভ'রে খেয়ে আসছি। ও আর আমি খাব না। আপনি যাকে যাকে দিতে ইচ্ছে হয় দিন। নয় ত কালকার জন্য রেখে দিন।"

বৃদ্ধা দেখল, পুরোহিত ঠাকুরকে কখনো কিছু খাওয়ানো হয় না। এই চ্যাঙারি তাঁকেই দেওয়া যাক। এই ভেবে বৃদ্ধা পুরোহিত ঠাকুরকে ডেকে দিলেন।

পুরোহিত এক মুদির দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাবল, বাড়ী নিয়ে গেলে হাতে হাতেই ত' সব উঠে যাবে। লুচি, সন্দেশ, চালকলা নৈবিদ্দি যজমানের বাড়ীতে পাওনা বেশির ভাগ জিনিসই পুরোহিত বিক্রী ক'রে চাল, ডাল, মাছ, তরকারীর যোগাড় করত। হঠাৎ তার মনে হ'ল, মুদিকে চ্যাঙারিটা দিয়ে নুন-তেলের দেনার কিছু উশুল করা যায়। মুদি খাতায় ২॥০ টাকা উশুল দিয়ে মিঠাইয়ের চ্যাঙারিটা পুরোহিতের কাছ হতে দিল। মুদির হঠাৎ মাথায় এল, এ মিঠাই বাড়ীর ভিতরে পাঠানো তো ডাহা লোকসান। তার চেয়ে একটু কুটুম্বিতা করা যাক। সে সেটা হাতে ক'রে তার মেয়ের বাড়ীতে গেল। গ্রামেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখে, বেহাই মশায় বাইরের ঘরের দাওয়ায় ব'সে বাকারি চাঁচছে। তার হাতে মিঠাই-এর চ্যাঙারিটি দিয়ে বলল—ছেলেপুলের জন্য কিছু মিঠাই এনেছি, ধরুন। বেহাই মশায় খুব খুশী হয়ে মুদীকে বসতে বললে। মুদী বললে—দোকান ফেলে এসেছি বেহাই মশায়, এখন বসব না।

এই বেহাইটি ছিল ভীষণ কৃপণ। সে ভাবলে—বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলে তার ভাগ্যে হয়ত একটা মিঠাই জুটবে। তার চেয়ে এগুলো ময়রায় দোকানে বিক্রী ক'রে এলে কিছু পাওয়া যাবে। সে গামছা ঢাকা দিয়ে চ্যাঙারিটা নিয়ে হারাধনের দোকানে এসে বললে—ভায়া, কিছু মিঠাই আছে, কিনবে? কাউকে কিছু ব'লো না।

হারাধন দেখল—তারই মিঠাই তার কাছে ফিরে এল। সে আগ্রহ সহকারে দুই টাকা দিয়ে মিঠাইগুলো কিনে নিল। তারপর ছেলেকে বলল—হরেরাম, যা-ত শীগ্‌গির, মুক্তকেশী ঠাকরুণের বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণ থাকে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

রাধাবিনোদ ময়রার দোকানে এসে পৌঁচলে ময়রা বলল—"বসুন ঠাকুর। তাজ্জব ব্যাপার! ও মোহরগুলোতে সত্যি আপনার অধিকার নেই। ও মোহর আমারই প্রাপ্য। ভগবান আমাকেই দিয়েছে।"

ব্রাহ্মণ—"তা'ত আমি গোড়া হতেই বলছি, তুমিই স্বীকার করনি। হঠাৎ কি করে ঠিক করলে যে ওতে তোমারই অধিকার!"

ময়রা—"এই দেখুন, আপনার সেই চ্যাঙারি। এতে পঞ্চাশটা সন্দেশ আমি দিয়েছিলাম।"

ব্রাহ্মণ—"হ্যাঁ, এ তোমার কাছে ফিরে এল কি করে?"

ময়রা—"সে খবর আপনি জানেন। আমাকে একজন বিক্রি ক'রে গেল। সে থাকগে; একটি ক'রে সন্দেশ ধরুন আর ভাঙুন।"

ব্রাহ্মণ—"হ্যাঁ, ভাঙলাম; ওঃ, এর ভিতরে যে মোহর!"

ময়রা—"প্রত্যেকটা ভাঙুন, প্রত্যেকটার ভিতরে একটা ক'রে মোহর আছে। এ কড়ির ভিতরে যেমন ক'রে মোহর এসেছিল—সন্দেশের ভিতর তেমনি ক'রে মোহর পুরেছিলাম। কিন্তু সেগুলো সব আমার কাছেই ফিরে এল। অতএব ঠিক করলাম ভগবান ও মোহর আমাকেই দিয়েছেন। এতে আপনার অধিকার নেই। এখন আপনি খোঁজ নিন গে, কি ক'রে এগুলো আমারই কাছে ফিরে এল। ব্রাহ্মণের ধন, গ্রহণ করতে মনটা চাচ্ছিল না—মনে ভয় কিন্তু ছিল। এখন আমার মন সাফ হয়ে গেছে।"

ব্রাহ্মণ—"আমি যাচ্ছি খোঁজ নিচ্ছি কি ক'রে তোমার কাছে এগুলো ফিরে এল। তবে আমারও হারাধন গোড়া হতেই বিশ্বাস—ও ধন তোমারই, আমার অধিকার নেই। তবু মনের কোণে একটু লোভও যে ছিলনা তা নয়; তোমার কথায় আমার মনও সাফ হয়ে গেল। দাও কিছু মিঠাই আর একবার জলযোগ ক'রে তোমাকে আশীর্বাদ ক'রে যাই।"

অহঙ্কারের পতন



এক সময় বাগদাদ শহরে আলি নামে এক নাপিত বাস করত। তার হাত এত দুরন্ত ছিল যে, তার চোখ বেঁধে দিলেও সে মাথা মুড়াতে বা দাড়িগোঁফ কামাতে পারত। শহরের মত আমীর ওমরাহ সকলেই তার কাছে কামাত। নাপিতের ব্যবসা তার 'একচেটে' ছিল বললেই চলে। ধনীদের দরবারে তার এত কদর বেড়ে গেল যে, দেমাকে মাটিতেই পা পড়ত না তার।

বাগদাদের কাছে একটি গ্রামে এক কাঠুরিয়া বাস করত। সে প্রত্যহ গাধার পিঠে কাঠ বোঝাই করে এনে শহরে বেচে যেত।

একদিন নাপিত কাঠুরিয়ার গাধার পিঠের সমস্ত কাঠ কিনে নিল। কাঠুরিয়া সমস্ত কাঠ নামিয়ে দিয়ে দাম চাইল।

নাপিত বলল, "এখনও সব কাঠতো দাওনি, দাম চাইছ কি বলে? সব কাঠ দিলে দাম পাবে।"

কাঠুরিয়া—"সব কাঠ দিয়েছি, ভাল করে দেখুন না।"

নাপিত বলল, "গাধার পিঠে কাঠের জিনটা দাওনি তো।"

কাঠুরিয়া—"বা! ওটা কেন দেব, ওটা তো বিক্রির কাঠ নয়। ওটা তো গাধার পিঠে বাঁধাই থাকে।"

নাপিত—"তা আমি কি জানি? গাধার পিঠে যত কাঠ আছে

সবই কিনে নিলাম, এই কথা ছিল কিনা ? সব কাঠ না পেলে দাম দেব কেন ? জবান ঠিক রাখ।”

কাঠুরিয়া—“গাধার পিঠের সব কাঠ মানে যে তার পিঠের কাঠের জিনটাও, একথা কখনও কেউ শোনে নি। এ তাজ্জব কথা ! আমি ওটা কিছুতেই দেব না !”

এইরূপ তর্কাতর্কি চলতে লাগল। নাপিত শেষে জবরদস্তি জিনটা নামিয়ে নিয়ে কাঠুরিয়াকে দূর করে দিল।

কাঠুরিয়া কাজীর কাছে গিয়ে আগাগোড়া সবই বলল। কাজী নিজে ছিল নাপিতের একজন খদ্দের। তিনি নালিশ শুনলেনই না। কাঠুরিয়া তখন উপরওয়ালা প্রধান কাজীর কাছে গেল ; তিনিও হেসে উড়িয়ে দিলেন।

কাঠুরিয়া কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়। সে খোদ সুলতানের নামে এক দরখাস্ত করল। সুলতান গরীব-দুঃখীর মা-বাপ ছিলেন। তিনি নাপিত ও কাঠুরিয়াকে একসাথে ডেকে পাঠালেন।

সুলতান কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন—“গাধার পিঠের সব কাঠ দেওয়াই কি চুক্তি ছিল ?”

কাঠুরিয়া—“হ্যাঁ, খোদাবন্দ, তা ছিল। কিন্তু কাঠের জিনটা সব কাঠের সামিল কেমন ক’রে হয় ?”

সুলতান—“কাঠের জিন বাদে সবকাঠের দাম ঠিক করা হ’ল— এমন কথা তোমরা কি বলেছিলে ?”

কাঠুরিয়া—“না জনাব, তা কিছু বলা হয় নি। ওসব কথা বলবার দরকারই হয় না। এটা কে না জানে সব কাঠ মানে কাঠের জিন বাদ ?”

সুলতান—“তবে আর উপায় কি ? চুক্তির কথা বেশ খোলসা করে বলা না থাকলে এইরূপ গোলোযোগ হয়। চুক্তির কথা পরিষ্কার না থাকায় নাপিতের জয় হল। তা হোক, তুমি একটা কথা শুনে যেও।”

এই বলে সুলতান কাঠুরিয়াকে চুপি চুপি একটি পরামর্শ দিয়ে বিদায় দিলেন। তারপর দুজনেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরে কাঠুরিয়া হাসতে হাসতে নাপিতের দোকানে ঢুকে বলল—"সেলাম, হাজম সাহেব। আমায় আর আমার সঙ্গীকে কামিয়ে দিতে হবে। সঙ্গীটি বাইরে অপেক্ষা করছে।"

নাপিত বলল, "আচ্ছা বেশ। কত দেবে বল?"

একটা মজুরী ঠিক করে কাঠুরিয়া কামিয়ে নিল। তারপর সঙ্গীটিকে আনবার জন্য বাইরে গেল।

নাপিত যখন দেখল যে, কাঠুরিয়া সঙ্গীর বদলে একটা গাধাকে টেনে নিয়ে আসছে, তখন বিস্মিত হয় জিজ্ঞাসা করল, "গাধাটা আনছ কেন? তোমার সঙ্গী কই!"

কাঠুরিয়া—"এই তো আমার সঙ্গী। একেই তো কামাতে হবে।"

নাপিত—"সে কি? গাধাটাকে কামাতে হবে। বেইমান বল্লিকটা বলে কি? দূর উল্লুখ; তোকে কামাতেই আমার যথেষ্ট ইজ্জত নষ্ট হয়েছে, আবার গাধাটাকে নিয়ে এসেছিস্।"

কাঠুরিয়া গাধাটাকে নিয়ে চলে গেল এবং সুলতানের কাছে গিয়ে নালিশ করল। সুলতান তৎক্ষণাৎ দুইজনকে তলব করে নাপিতকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কাঠুরিয়ার সঙ্গীটিকে কেন কামালে না? তোমার সঙ্গে কি ওর এ সম্বন্ধে কোন চুক্তি ছিল না?"

নাপিত—"হ্যাঁ হুজুর, তাকে আর তার সঙ্গীকে কামানোর চুক্তি ছিল। কিন্তু গাধা যে মানুষের সঙ্গী, তা কেউ কখনও শুনেছে জনাব?"

সুলতান—"হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু গাধার পিঠের সব কাঠ মানে তার পিঠের কাঠের জিনটা পর্যন্ত, এ কথাই বা কে শুনেছ? কোন

"কথা শুনব না, গাধাটাকে কামাও, তা' না হ'লে তোমার কয়েদ হবে।"

নাপিত নিরুপায় হয়ে উত্তর দিল—"আচ্ছা খোদাবন্দ, আপনার হুকুম তামিল করছি।"

দাম্ভিক নাপিত শেষে গাধাটকে কামাতে বাধ্য হল। কৌতুক দেখবার জন্য দলে দলে লোক জমে গেল। বাগদাদ শহরের হাজার হাজার লোকের সামনে নাপিতকে গাধা কামাতে হল। চারিদিক থেকে ব্যঙ্গ উপহাস চলতে লাগল। লোকে অহঙ্কারের পরিণাম দেখে খুব খুশী হল।

যার যা খাদ্য



কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার পুরোহিতকে সঙ্গে ক'রে ছদ্মবেশে রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে এক জমিদারের বাড়ীতে উঠলেন। জমিদার রাজাকে চিনতে পারলেন না, কিন্তু চেহারা দেখে বুঝলেন—কোন রাজ পরিবারের লোক কিংবা কোন ধনী ব্যক্তি হবেন। জমিদার খুব আদর ক'রে তাঁকে বসালেন। তখন বেলা দুপুর হয়ে গেছে। রাজা স্নান ক'রে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। জমিদার তখন একটা থালায় ক'রে অনেক রাজভোগ্য খাবার নিয়ে এসে রাজাকে দিলেন। আর পুরোহিতকে বললেন—"আপনি আমার দেবালয়ে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

রাজা সে খাদ্য নিজে না খেয়ে পুরোহিতকে দিলেন। পুরোহিত দেখলেন জমিদারের বাড়ীর দরজায় একজন তাপস ব'সে আছেন। তিনি সেই থালাটি নিয়ে গিয়ে তাপসের হাতে দিলেন।

তাপস থালাটি হাতে ক'রে নিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু যাচ্ছেন। তাপস ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ডেকে থালাটি দিয়ে বললেন, "আপনি খান্।"

বৌদ্ধভিক্ষু জমিদারের বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দেখলেন রাজা ব'সে আছেন। সেই খাদ্যের থালা নিয়ে গিয়ে ভিক্ষু রাজার সম্মুখে রেখে বললেন, "আপনি খান।"

ব্যাপার দেখে জমিদার তো অবাক। জমিদার খেতে দিলেন রাজাকে, সেই খাদ্য তিন হাত ঘুরে আবার রাজার কাছেই এল। জমিদার রাজাকে বললেন,—"আপনি নিজে না খেয়ে ব্রাহ্মণকে দিলেন কেন?" রাজা বললেন—"আমি দানের পাত্র নই—এই ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্যক্তি। ইনি উপস্থিত থাকতে আমি আপনার খাদ্য কি ক'রে ভোজন করি? আপনার খাদ্য এতই দামী যে, এ খাদ্য ব্রাহ্মণকে দান করলে পুণ্য হ'বে ভেবে আমি এঁকে দিয়েছিলাম।"

জমিদার পুরোহিতকে শুধালেন—"আপনি আহার করলেন না কেন?"

পুরোহিত বললেন—"আমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি অনেক। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান আমার হয়নি। আমি সংসারী, আমার ছেলেপুলে স্ত্রী আছে। আমি রাজসেবা করি। ভোগ সুখে আমার লোভ আছে। কিন্তু ঐ তাপস সংসার ত্যাগ করেছেন—প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন—ইনি নির্লোভ নিষ্পাপ ব্যক্তি। নিজে কখনও আহারের আয়োজন করেন না—যেখানে যা পান তাই খান। ওঁকে দান করলে পুণ্য হবে ব'লে আমি নিজে না খেয়ে ওঁকে দিয়েছি।"

জমিদার তাপসকে শুধালেন—"আপনি কেন আহার করলেন না?"

তাপস বললেন—"দেখুন আমি সংসার ত্যাগ করেছি। কিন্তু আমারও একটা কুটীর আছে—বনে বনে ফলমূলের সন্ধান করি, লোকালয়ে এসে দু' মুঠো চাল পেলে তা নিয়ে গিয়ে ফুটিয়ে খাই। হরিণের চামড়া পেতে শুই, ঘরে জলের কলসী রাখি, একটা প্রদীপও জ্বালি। আহার না জুটলে উদ্বিগ্ন হই। আমি মুক্তপুরুষ নই। আর এই ভিক্ষুর ঘর নেই, বিছানা নেই, খাওয়ার কোন সংস্থান নেই। যেখানে রাত্রি গভীর হয় সেখানেই মাটিতে শুয়ে পড়েন। ক্ষিধে পেলে গৃহস্থের দ্বারে ভগবান বুদ্ধের নাম ক'রে এসে দাঁড়ান। কিছু

পান তো খান, না পেলে উপবাসী থাকেন। তৃষ্ণা পেলে পুকুরে নেমে জল খান, একটু নেকড়া পরে লজ্জা নিবারণ করেন। ইনিই মুক্ত-পুরুষ। এঁকে দান করলেই পুণ্য হয়। সে জন্য ও খাদ্য এঁকেই দিলাম।" জমিদার ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার দেহ জীর্ণ, শীর্ণ, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে "আপনি বড়ই ক্ষুধার্ত, হয়ত কয়েকদিন উপবাসী আছেন। তবু আপনি এই সুখাদ্য পেয়ে আমায় অতিথিকে দান করলেন কেন?"

ভিক্ষু বললেন—"দেখুন আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, কয়েকদিন থেকে উপবাসী আছি একথা সত্য। কিন্তু যে খাদ্য আমার জুটল তা রাজার খাদ্য, ভিক্ষুর খাদ্য নয়। এরকম খাদ্য খেলে ভিক্ষুর ধর্ম হানি হয়। এ খাদ্য রাজা বা ধনী শ্রেষ্ঠীর উপযুক্ত। তাই আমি ঐ ধনী ব্যক্তিকেই দান করলাম।"

জমিদার ও অন্যান্য সকলেই বুঝলেন, দান করতে হলে যার যা যোগ্য তাকে তাই দিতে হয়। দরিদ্রকে হাতী দান করতে নেই, কুকুরকে পায়স পিঠে খেতে দিতে নেই, সন্ন্যাসীকেও শাল দিতে নেই।

জমিদার তখন পুরোহিতকে ডেকে খেতে দিলেন,—আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ তরকারী, দুধ, দই, মিষ্টি। তাপসকে দিলেন জল এবং আটা ও একটু ঘি এবং ভিক্ষুকে দিলেন—ভুট্টার রুটি, গুড় ও মাটির ভাঁড়ে জল। রাজা তাঁর রূপার থালায় নানারকম সুখাদ্য খেলেন। সকলেই খুসী হয়ে চলে গেলেন।

সময় থাকতে কাজ করতে হয়



কোন দেশে এক ধনী লোকের একটি ক্রীতদাস ছিল। সে এক সময়ে মনিবের একটি পুত্রকে জলে ডোবা হইতে বাঁচাইয়াছিল। তাহারই পুরস্কার-স্বরূপ সে মুক্তিলাভ করিল। শুধু মুক্তি নয়—ধনী লোকটি একটি ছোট জাহাজে অনেক মালপত্র বোঝাই করিয়া তাহাকে দান করিল। ক্রীতদাস সেই জাহাজ লইয়া বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে ঝড়ে জাহাজ-ডুবি হইয়া লোকজন সহ তাহার মালপত্র সব ডুবিয়া গেল। ক্রীতদাস নিজে ভাসিতে ভাসিতে একটি দ্বীপে গিয়া পৌঁছিল। সমুদ্রতীর হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ক্রীতদাসটি দেখিল, একটি বিরাট রাজপ্রাসাদ, সম্মুখে লোকারণ্য। ক্রীতদাসটির কোমরে সামান্য একটু নেকড়া; কিন্তু যাহারা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের পরণে সুন্দর সুন্দর পোশাক। তাহা হইলে কি হয়?—তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাজা এসেছেন, রাজা এসেছেন, আসুন রাজা বাহাদুর! স্বাগত! স্বাগত!"

বহুলোক এক সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল। রাজপুরীতে

নহবৎ বাজিয়া উঠিল, পতাকা উড়িতে লাগিল। পাত্রমিত্রগণ ক্রীতদাসকে আগাইয়া লইয়া গেল, স্নান করাইল, রাজবেশ পরাইল, রাজমুকুট পরাইল, শেষে সিংহাসনে বসাইল। ক্রীতদাসের মস্তকোপরি রাজছত্র শোভা পাইতে লাগিল।

ক্রীতদাস তো স্তম্ভিত! সে জাগিয়া আছে কিংবা স্বপ্ন দেখিতেছে কিংবা তাহার মতিভ্রম হইয়াছে, স্থির করিতে পারিল না, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপার কি? তোমরা আমার মতন পথের কাঙ্গালকে রাজা করলে কেন? তোমরা কি দেশশুদ্ধ লোক ক্ষেপেছো?"

তাহারা বলিল—"ক্ষেপিনি। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমাদের একজন রাজা দাও। আমরা কতকগুলি মুক্তাত্মা, —মানুষের দেহ ধারণ করে এখানে আছি। ভগবান এক একটি মানবসন্তানকে বৎসর বৎসর আমাদের উপর রাজত্ব ক'রতে পাঠান। এবার আপনি এসেছেন। আপনি ভগবানের প্রেরিত। আপনি কাঙ্গাল হোন, মূর্খ হোন্, হীনজন্মা হোন্, আপনি যখন ভগবানের প্রেরিত, তখন আপনি এক বছরের জন্য আমাদের রাজা।"

ক্রীতদাস—এক বছর পরে আমার কি গতি হ'বে?

মন্ত্রী—অন্যান্য রাজার যে গতি হ'য়েছে তাই হ'বে। এক বছর পরে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে একটা জাহাজে চড়িয়ে সে রাজাকে একটি নির্জন দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসা হয়।

ক্রীতদাস—যারা আগে রাজা ছিল তারা এর কোন প্রতিকারের উপায় করে নি?

মন্ত্রী—কেউ না। সকলেই রাজভোগে বিভোর হ'য়ে কাটিয়েছে। শেষের দিনের কথা একবারও ভাবে নি। শেষদিন যখন এসেছে প্রাণপণে গলা ছেড়ে কেবল কেঁদেছে, আর কাকুতি-মিনতি করেছে।

জ্ঞানবৃদ্ধ লোকটি আসিলে ক্রীতদাস জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি

বলুন দেখি,—যখন নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেবে, তখন কি উপায় ক'রলে সেখানে দুঃখ পাব না ?"

জ্ঞানবৃদ্ধ—উপায় আছে, কিন্তু সে জন্য তাড়াতাড়ি কেন? কিছুকাল সুখ ভোগ করুন। দু'মাস আগে হ'তে ব্যবস্থা ক'রলেই হ'বে।

ক্রীতদাস—না আমার ভোগে কাজ নেই। আজ হ'তেই আমি ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ক'রতে চাই। কি উপায় বলুন।

জ্ঞানবৃদ্ধ—যে নির্জন দ্বীপে আপনাকে নির্বাসন দেওয়া হ'বে, এখন হ'তে সেই দ্বীপে লোকজন পাঠিয়ে ঘরদুয়ার তৈয়ারী করান, রাজপুরী নির্মাণ করান—এখান হ'তে লোকজন পাঠিয়ে নগর বসান, সেখানে বনজঙ্গল কাটিয়ে জমি প্রস্তুত করান, এখান হ'তে লোজকন গিয়ে সেখানে চাষবাস করুক। আপনি যখন এ দেশের রাজত্ব ছেড়ে যাবেন, তখন নতুন দেশে গিয়ে রাজা হ'তে পারবেন। যতদিন রাজা আছেন, ততদিন যা বল্‌বেন লোকে তা শুনবে।

ক্রীতদাস—আজই আমি সেখানে লোক পাঠাচ্ছি, যতদিন না সেখানে লোকের বসবাস করাতে পারি, ততদিন রাজভোগ আমার সইবে না। আচ্ছা,—আপনি যে উপদেশ দিলেন, তা' কি আগেকার রাজাদের দেন নি।

জ্ঞানবৃদ্ধ—হ্যাঁ. দিয়েছি বৈকি, কিন্তু তাঁরা বল্‌তেন,—"ও সব কথা এখন থাক—দু'মাস আগে থেকে ব্যবস্থা ক'রলেই হ'বে।"

জ্ঞানবৃদ্ধের উপদেশমত ক্রীতদাস সমস্ত ব্যবস্থাই করিল। নূতন দ্বীপকে রাজধানী করিয়া তুলিতেই ক্রীতদাসের বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিনের জন্যও রাজসুখ ভোগ করিবার অবসর হইল না। শেষে দিন যত আগাইয়া আসিতেছিল, ক্রীতদাস ততই আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। অন্য রাজারা কিন্তু ভয়ে অস্থির হইত, আর ভাবিত, কাঁদিয়া কাটিয়া রাজত্বের দিন যেমন করিয়া হউক বাড়াইয়া লইবে।

শেষদিন অসিল। রাজার পোষাক-পরিচ্ছদ সব বিধিমত কাড়িয়া লওয়া হইল। যেমন ফকির হইয়া ক্রীতদাস এদেশে আসিয়াছিল, তেমনি ফকির অবস্থায় তাহাকে একটি ভাঙ্গা জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইল। ক্রমে জাহাজ নূতন দ্বীপে পৌঁছিল। সেখানে নবনির্মিত নগরে অসংখ্য লোক রাজপরিচ্ছদ হাতে হাতী-ঘোড়া সাজাইয়া, বাদ্যভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল। ক্রীতদাসকে রাজবেশ পরাইয়া, সোনার রথে চড়াইয়া তাহারা চিরদিনের রাজা করিয়া লইয়া গেল। ক্রীতদাস ভোগে বিভোর না হইয়া আগে হইতেই পরজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল।



দীন পরিচ্ছদের রাজ সম্মান

একসময়ে পারস্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। বাদশাহ ভোগবিলাসে দিন কাটাতেন। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁর ভাল লাগত না। তিনি নিজে থাকতেন সরাবে মশগুল হয়ে।

রাজ্যের মূলশক্তি শিথিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রবল হয়ে উঠল—চারিদিকের দুশ্‌মনরা সুযোগ খুঁজছিল, তারা পারস্য আক্রমণের জন্য উদ্যত হল। এমন সময় অকর্মণ্য রাজার মৃত্যু হয়। আমীর-ওমরাহরা রাজবংশের একজন সংযত চরিত্রের সুযোগ্য যুবককে শাহী তখ্‌তে বসালেন।

নতুন রাজা দেখলেন যে, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অত্যাচারী, অবিচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। তারা যথারীতি রাজকর প্রেরণ করে না, অথচ প্রজাগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। প্রজাগণকে তারা পোষণ একেবারেই করে না, কেবল শোষণ করে। তারা নিজেরা এক-একজনে ধনকুবের হয়ে উঠেছে, অথচ শাহী তহবিলে অর্থ নেই। নতুন রাজা একে একে শাসনকর্তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলেন এবং উপযুক্ত লোক বেছে তাদের হাতে প্রাদেশিক

শাসনের ভার দিতে লাগলেন। একটি প্রদেশের শাসনভার দিলেন মেষপালকের সর্দার দারা নামে একজন তেজস্বী ব্যক্তিকে।

এই দারা ছিল একজন সামান্য মেষপালকের সন্তান। দারার যৌবনকাল কেটেছিল পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ চরিয়ে ও নেকড়ে বাঘ তাড়িয়ে। প্রৌঢ় বয়সে দারা মেষের ব্যবসায়ে বেশ বড়লোক হয়ে উঠেছিল। দারার মধুর আচরণ ও চরিত্রের উদারতায় গ্রামের সকল লোক বশীভূত হয়ে উঠল।

দারার আচরণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা রাজার কানে গেল। দেখলেন, যে ব্যক্তি সামান্য মেষপালক থেকে একটি অঞ্চলের সর্দার হয়ে উঠেছে, তাকে শাসনের ভার দিলে নিশ্চয়ই রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চলবে।

দারা দারিদ্র্যদশা থেকে দেশের শাসনকর্তা হলেন—এতে বহু লোকের মনে হিংসার ভাব জাগল। লোকে তখন দারাকে অপদস্থ করার জন্য চক্রান্তের জাল রচনা করতে লাগল। কেউ কেউ রাজার কানে দারার বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে লাগল। তারা বলতে লাগল—"জাঁহাপনা, দারাকে যত ভালমানুষ মনে করেন—সে কিন্তু ততটা নয়। ভাল লোকই সে ছিল—শাসনকর্তা হ'য়ে তার মাথা বিগড়ে গেছে। তাতেও কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু সে রাজস্ব আদায় করে ও ঘুষ নিয়ে নিজের সিন্দুক ভরতি করছে। অতি সামান্য অংশই সে রাজকোষে জমা দেয়।"

রাজা একথা বিশ্বাস করলেন না। তখন চক্রান্তকারীর দল বলল,—"প্রমাণস্বরূপ আমরা বলছি যে, সে যেখানেই যায় তার সঙ্গে সঙ্গে একটি সিন্দুক থাকে। যে উটের পিঠে সিন্দুকটি থাকে সে সিন্দুকের ভারে উটটি দ্রুত চলতে পর্যন্ত পারে না। গভীর রাত্রে দারা ঐ সিন্দুক খোলেন—তখন কেউ কেউ গোপনে লক্ষ্য করেছে সিন্দুকটি মোহর ও জহরতে ভরা। খোদাবন্দ পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।"

রাজা পরীক্ষা করবার জন্য যাত্রা করলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করবার সময় দেখলেন দারা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একটি সুসজ্জিত উটের পিঠে সেই সিন্দুকটি। ঐ উটটিকে ঘিরে দশজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। রাজা কোন কথা না বলে একেবারে উটের কাছে গিয়ে দারাকে বললেন,—"এই সিন্দুকটি খোল, এর মধ্যে কি আছে দেখব!"

দারা সিন্দুকটি খুললেন। বাদশাহ কি দেখলেন! দেখলেন—মেষপালকের একটা জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক।

রাজা বললেন,—"এ পোষাকটিকে এভাবে রেখেছ কেন? এর জন্য এত প্রহরীই বা কেন?"

দারা বললেন,—"খোদাবন্দ, আমি পদ পেয়েছি, তাতে আমার মাথা ঠিক রাখা কঠিন, আমার অহমিকা জন্মাবার কথা। যাতে আমার মনে কোন অহমিকা না জন্মে—যাতে আমি আমার নিজধর্ম ভুলে না যাই, সেজন্য আমার যৌবনের জীর্ণ পোষাকটিকে রাজ-সম্মান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখি।"

রাজা বললেন,—"দারা, তুমিই রাজ্য-শাসনভার বহন করবার উপযুক্ত? তোমাকে আরও দুটি প্রদেশের শাসনভার দিলাম।"

দারা অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।



অধ্যবসায়

প্রাচীনকালে মথুরায় একজন বণিকের অকাল মৃত্যু হলে তার স্ত্রী বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়ল। স্বামী যে অর্থ রেখে গিয়েছিল, আত্মীয়-কুটুম্বরা তা লুটে পুটে নিল। আত্মীয়-স্বজনরা চিরদিনই অনাথা আত্মীয়াদের সঙ্গে এরকম ঘনিষ্ঠতাটুকু করে থাকেন। তখন বণিক্-পত্নীর সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ল। বণিক একটি ছেলে রেখে গিয়েছিল। সেই ছেলেটিই তার সম্বল। আত্মীয়দের বাড়ীতেই ঝি-গিরি করে বণিকপত্নী তার ছেলেটিকে মানুষ করতে লাগল। পাঠশালার একজন শিক্ষক বিনা বেতনে ছেলেটিকে সামান্য লেখাপড়া শেখাল।

ছেলেটির বয়স সতের বছর হলে মা বললেন,—"বাবা মণি, এবার কিছু রোজগারের চেষ্টা কর। এ শহরে একজন সওদাগর আছেন, তিনি ব্যবসায়ে সাহায্য করবার জন্য অনেককে বিনাসুদে টাকা ধার দেন। তাঁর কাছে যাও।"

মার কথা শুনে মণিদত্ত সওদাগরের কাছে গেল; কিন্তু গিয়ে দেখে তিনি একজন যুবককে তিরস্কার করছেন,—

"তুমি সব টাকা নষ্ট করলে, কিছুই লাভ করতে পারলে না, উল্টে

মূলধন পর্যন্ত খোয়ালে। আবার আমার কাছে এসেছ? যে টাকা রোজগার করতে জানে,—সে ঐ মরা ইঁদুরটা হতেও টাকা করতে পারে। যাও, দূর হয়ে যাও।”

এ ব্যাপার দেখে মণিদত্ত আর টাকা সাহায্য চাইতে সাহস করল না,—কেবল বলল, “আমি মরা ইঁদুরটা নিয়ে চললাম, আমার নাম খাতায় লিখে রাখুন। সময় হলে শোধ দেব।” বালকের কথা শুনে সওদাগর হাসতে লাগলেন।

মণিদত্ত কিন্তু সত্য সত্যই মরা ইঁদুরটা নিয়ে চলে গেল। একজন লোক বিড়াল ভালবাসত। সে বিড়াল পুষত। দু' মুঠো ছাতুর বদলে সে মরা ইঁদুরটা কিনে নিল। মণিদত্ত এক কলসী জল আর ঐ ছাতু নিয়ে নগরের চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠুরিয়ারা বিক্রয়ের জন্য নগরে কাঠ নিয়ে আসত। মণিদত্ত ঐ ছাতু ও জল তাদেরকে বিতরণ করতে লাগল। তাতে প্রত্যেকের কাছ থেকে দু' একটা টুকরো করে কাঠ পেল। ঐ কাঠ বাজারে বিক্রি করে সেই টাকায় আবার পরদিন ছাতুর লাড়ু ও একলোটা জল নিয়ে চৌরাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল। সেদিন আরও বেশী কাঠ পেল। প্রত্যহ এমনি করে সে কাঠ জড়ো করতে লাগল। তারপর যখন বর্ষা পড়ল, তখন শুকনো কাঠের দাম অনেক বেড়ে গেল। মণিদত্ত তখন জমা কাঠগুলো বেচে বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করল।

সেই টাকায় মণিদত্ত প্রথমে কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করল। কাঠুরিয়াদের কাছ হ'তে সে প্রত্যহ কাঠ কিনে নিত। ক্রমে সে ছুতোরখানা খুলল। নিজেও ছুতোরের কাজ শিখল।

এইভাবে মিতব্যয়িতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার গুণে মণিদত্ত ক্রমে ক্রমে একজন বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। তখন সে একটা সোনার ইঁদুর গড়ে সেই ধনী সওদাগরকে পাঠিয়ে দিল। সওদাগরও খুশি হয়ে মণিদত্তকে নিজের কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন ও বহু টাকা যৌতুক দিলেন।



আদব-কায়দা

একজন জমিদার একজন উকিলের কাছে প্রায়ই কোন-না-কোন দ্রব্য উপহার পাঠাতেন। তা বহন করে নিয়ে যেত গোবিন্দ নামে একজন ভৃত্য। গোবিন্দ বড় ঘরের ছেলে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিছু লেখাপড়াও করেছিল, কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত মন্দ বলে জমিদারের বাড়িতে সামান্য চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিল।

গোবিন্দ উকিলবাবুর বাড়িতে কতবার কত জিনিস উপহার নিয়ে এসেছে, উকিলবাবু কিন্তু কখনও একটা পয়সাও তাকে বকশিস্ দেন্নি।

সেবার পূজোর সময়ে একটা বড় মাছ নিয়ে গোবিন্দ উকিলবাবুর বাড়ীতে এল। ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর মাছটি ফেলে দিয়ে গোবিন্দ বিনা ভূমিকায় বলে উঠল, "এই নিন, কর্তা এই মাছটা পাঠিয়েছেন।"

উকিলবাবু চেয়ারে বসেছিলেন, তিনি মাছটা পেয়ে খুব খুশী হলেন, কিন্তু গোবিন্দের বে-আদবিতে বিরক্তও হলেন।

উকিলবাবু বললেন—"দেখ গোবিন্দ, তুমি বড়লোকের বাড়িতে এতদিন চাকরি করছ—কিন্তু কিছুমাত্র আদব-কায়দা শিখলে না। জান, তোমার কর্তামশাই আমার বিশেষ বন্ধু? তোমার কি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত?"

গোবিন্দ—"আজ্ঞে আমার কসুর হয়েছে। আমরা মুখ্যু লোক। কি করে কথা বলতে হয় জানি না।"

উকিল—"ও জান না! বুঝি, তবে শিখিয়ে দিচ্ছি। এসে দেখি এই চেয়ারখানায় বসো দেখি।"

গোবিন্দ—"কি বলছেন হুজুর, আমি চেয়ারে বস্‌ব কি করে!"

উকিল—"না, তুমি একবার বসো, সঙ্কোচ করো না।"

এই বলে উকিলবাবু জোর করে গোবিন্দকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তারপর মাছটা বাইরে নিয়ে গিয়ে তা হাতে করে অতি ধীরে ধীরে ঢুকলেন, তারপর আস্তে আস্তে মাছটিকে রেখে বললেন—"সেলাম হুজুর, রাজাসাহেব হুজুরকে তাঁর নমস্কার জানিয়ে এই সামান্য মাছটি উপহার পাঠিয়েছেন। দয়া করে হুজুর এটা গ্রহণ করুন। হুজুরের স্বাস্থ্য কেমন আছে—রাজাসাহেব তা জানতে চেয়েছেন। আর।—"

গোবিন্দ—"তাই নাকি? বেশ বেশ। চমৎকার মাছটিতো? রাজাসাহেবকে বলবে, আমি ভাল আছি, মাছটা পেয়ে খুব খুশি হলাম—আমার ধন্যবাদ ও নমস্কার তাঁকে জানাবে (মুহুরীর দিয়ে ফিরে) ওহে একে পাঁচটাকা বক্‌শিস দাও তো। আর বাড়ির ভিতর থেকে কিছু জলখাবার আনিয়ে দাও দেখি।"

উকিলবাবু প্রথমটা গোবিন্দের কথায় অবাক হয়ে গেলেন। এদিকে গোবিন্দ ছুটে এসে তাঁর পায়ে ধরেছে। উকিলবাবু নদীয়া জেলার রসিক লোক, হাত ধরে গোবিন্দকে উঠিয়ে বললেন—

"গোবিন্দ, তোমাকে আমি আদব-কায়দা শেখাতে গেলাম—তুমিই আমাকে আমার কর্তব্য শিখিয়ে দিলে। সত্যিই গোবিন্দ, তোমাকে কখনও কিছু দেওয়া হয়নি—বড়ই অন্যায় হয়েছে।"

এই বলে গোবিন্দকে উকিলবাবু সেদিন দশ টাকা বক্‌শিস্ দিয়ে বাকি বকেয়া শোধ করলেন। গোবিন্দও হাসতে হাসতে চলে গেল।

খলিফা ওমর



এক সময় আরব দেশে খলিফা ওমর নামে এক সদাশয় নরপতি ছিলেন। তিনি প্রজাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখবার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ও শহরের পথে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন গভীর রাতে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক গ্রামের প্রান্তে একজন দরিদ্র বিধবার কুটিরের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পথে দাঁড়িয়ে তিনি শুনলেন যে, কুটিরের ভিতর থেকে কয়েকজন শিশুর কান্নার আওয়াজ আসছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করবার জন্য এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন একজন বিধবা রমণী উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে জ্বাল দিচ্ছে ও শিশুদের বলছে "বাছারা, একটু সবুর কর, রান্না হয়ে গেলেই খেতে পাবি।"

বড় ছেলেটি বলল,—"রান্না তো অনেক্ষণ চড়িয়েছো, কখন রান্না হয়ে গিয়েছে। এবার খেতে দাও।"

ওমর এগিয়ে গিয়ে বিধবাকে বললেন "মা, কেন দেরী করছ? ছেলেরা যে খিদেতে সারা হয়ে গেল, ওদের খেতে দাও।"

রমণী বলল, "বাবা, হাঁড়িতে কি কিছু আছে যে ওদের খেতে দেবো। আমার পোড়া কপাল। সারাদিন বাড়ি বাড় ঘুরে আজ কিছুই পাইনি।"

ওমর—"তবে এতক্ষণ কি রান্না করলে ?"

মা—"শুধু জল আর পাথর।"

ওমর—"তার মানে কি ?"

মা—'বাবা, বলতে বুক ফেটে যায়,—এতক্ষণ আমি ছলনা করছিলাম ! ওদের দেখাচ্ছিলাম যে আমি রান্না করছি। ওরা কতক্ষণ আর জেগে থাকবে ? কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেই আজকের মত রেহাই পাবো।"

একথা শুনে ওমরের চোখে জল এল। তিনি চোখ মুছে বললেন, —"মা, আরও কিছুক্ষণ ওদের ঐভাবে ভুলিয়ে রাখ। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।"

গ্রামের প্রান্তে খলিফার ঘোড়া বাঁধা ছিল। কাল বিলম্ব না করে খলিফা বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে পাঁচ-সাত দিনের মত খাবার এনে নিজে বয়ে সেই গভীর রাত্রিতে খলিফা আবার সেখানে উপস্থিত হলেন।

খাদ্যদ্রব্যগুলি বিধবার হাতে দিয়ে ছেলেদের প্রত্যেকের হাতে একমুঠো করে খেজুর তুলে দিলেন। বিধবা রান্না শুরু করল—খলিফা শিশুদের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। রান্না হয়ে গেল। তিনি শিশুদের নিজের হাতে খাওয়ালেন।

বিদায় দেবার সময়ে তিনি বিধবাকে বললেন—"মা, তুমি এদেশের খলিফার কাছে গিয়ে নিজের দুরবস্থার কথা জানাও না কেন ?"

বিধবা বলল,—"বাবা, আমি বড় দুঃখিনী, আমি তাঁর কাছে যেতে সাহস করি না। আমাদের মত দুঃখীদের কথা শুনবার অবসর কি তাঁর হবে ?"

ওমর বললেন—"হ্যাঁ, তা বটে ! আচ্ছা, আমি নিজে তোমার দুঃখের কথা খলিফাকে বলে তোমার জন্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেব।"

ওমর বিদায় নিলেন, সমস্ত পথ তিনি ভাবতে ভাবতে এলেন—"যতদিন দেশে একজনও অনাহারে থাকবে—ততদিন আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না।"

বাড়ি ফিরে ওমর দরিদ্র বিধবার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।



অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ

একসময় সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। জেস্‌লার নামে একজন অস্ট্রিয়াদেশীয় শাসনকর্তা সুইসদের উপর বড়ই অত্যাচার করত। সে বাজারের চৌরাস্তার উপরে একটি খুঁটির উপর নিজের টুপি রেখে ঘোষণা করল—সকলকেই খুঁটির সম্মুখে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করতে হবে।

বেশীর ভাগ সুইসই কিন্তু জুলুমবাজ জেস্‌লারের টুপিকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করতে রাজী ছিল না—কিন্তু সাহস করে শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করতেও পারত না। লোকে বাজারের পথ দিয়ে যাতায়াত করাই ছেড়ে দিল।

উইলিয়ম টেল ছিল পল্লীগ্রামের লোক। কোন কারণে সে নগরে এসেছিল,—তার সঙ্গে ছিল আট বৎসর বয়সের পুত্র। বাজারের পথ দিয়ে যাবার সময়ে সে জেস্‌লারের টুপিকে অভিবাদন না করেই চলে যাচ্ছিল। প্রহরী তাকে ধরে বললে,—"এখানে মাথা নোয়াও, রাজার হুকুম জান না?"

টেল—"না, আমি মাথা নোয়াব না। আমি যেখানে সেখানে মাথা নোওয়াই না।"

প্রহরী—"যদি মাথা না নোওয়াও, তবে তোমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাব।"

টেল—"বন্দী কর, মাথা কিছুতেই নোওয়াব না।"

প্রহরী টেলকে বন্দী ক'রে জেস্‌লারের কাছে নিয়ে গেল।

জেস্‌লার জিজ্ঞাসা করল,—"তোমার নাম কি?"

টেল—"আমার নাম উইলিয়ম টেল।"

জেস্‌লার—"তুমি কি সেই টেল, লক্ষ্যভেদে যার সমকক্ষ কেউ নেই বলে শোনা যায়?"

টেল—"লক্ষ্যভেদে আমি অনেক ক্ষেত্রে জয়লাভ করেছি সত্য,—কিন্তু আমার সমকক্ষ কেউ নেই, একথা বলতে পারি না।"

জেস্‌লার—"তোমার সঙ্গে ওটি কে?"

টেল—"আমার পুত্র।"

জেস্‌লার—"জান, তুমি কি অপরাধ করেছ? এর দণ্ড কি, তা জান?"

টেল—"অপরাধ কিছু করেছি ব'লে তো মনে হয় না, তবুও যদি সাজা দিতে হয় দিন।"

জেস্‌লার—"আচ্ছা, তুমি একজন প্রসিদ্ধ ধনুর্ধর। তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি যদি তুমি তোমার ঐ ছেলের মাথায় একটি আপেল রেখে ১০০ গজ দূর থেকে সেটাকে বিঁধতে পার।"

টেল—"তুমি কি মানুষ—না রাক্ষস? তুমি বাপকে দিয়ে পুত্রহত্যা করাতে চাও? না, আমি এরূপ শর্তে মুক্তি চাই না।"

জেস্‌লার—"বটে! তোমার এত তেজ? তুমি ভেবেছ এই লক্ষ্যভেদ না করলেই তুমি তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে? না, তা হবে না। তোমার ঔদ্ধত্যের দণ্ডস্বরূপ তোমার পুত্রটিকে হত্যা করা হবে।"

টেল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। টেলের পুত্র এলবার্ট, সে টেলের গায়ে হাত দিয়ে বলল,—"বাবা, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ?

তুমি তো এমন লক্ষ্য অনেকবারই ভেদ করেছ—তবে ভয় পাচ্ছ কেন ?"

টেল—"বৎস, তোমার মাথার উপরে আপেল রেখে কখনো লক্ষ্যভেদ করিনি। যদি হাত কেঁপে যায় তাহলে কি হবে ?"

পুত্র—"আমার কিছু মাত্র ভয় নেই বাবা। তুমি ভয় পেয়ো না। —একটা গাছের ডালে আপেল আছে মনে ক'রে তুমি তীর ছোঁড়। কখনো তোমার হাত কাঁপেনি আজও কাঁপবে না। আর যদি কাঁপেই, তবেই আমি মরব—মরতে আমি ডরাই না।"

টেল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে উঠল,—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। আপেল নিয়ে এস।"

জেস্‌লার আপেল আনিয়ে টেলের ছেলের মাথায় আপেল রেখে লক্ষ্যভেদ করবার জন্য টেলকে আদেশ দিল। চারিদিকে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেল—সৈনিকগণ ছাড়া সকলেই সুইস। সুইসরা এক মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল। টেল তার পুত্রকে আলিঙ্গন করে বলল,—"বৎস, ভয় পেয়ো না, নড়ো না—ভগবানকে ডাক।"

পুত্র বলল,—"বাবা, আমি স্থির হয়ে থাকব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তীর ছোঁড়।"

টেল চীৎকার করে বলল,—"সকলে একটুও শব্দ না করে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইল।

টেল তীর নিক্ষেপ করল। আপেল দুই ভাগে খণ্ডিত হল। টেল তীর ছুঁড়েই চোখে আঁধার দেখতে লাগল, তার মাথা ঘুরতে লাগল—সে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল।

চারিদিকের জয়ধ্বনিতে টেল বুঝল—পুত্রের কোন ক্ষতি হয়নি। বীরপুত্র ছুটে এসে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—"বাবা, আমি অক্ষত।"

আনন্দের আবেগে টেলের চোখ দিয়ে এতক্ষণে জল ঝরতে লাগল।

জেস্‌লার টেলকে ডেকে পাঠিয়ে বলল—"বীর, তুমি মুক্তি পেলে. তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, তোমার ছেলে বেঁচে গেল।"

টেল বলল,—"কেবল আমার ছেলে নয়, তুমিও প্রাণে বেঁচে গেলে। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। যদি আমার তীর ছেলের গায়ে লাগত—তাহলে—আর একটি তীর দেখছ আমার কোমরবন্ধে গোঁজা, এইটি দিয়ে তোমাকেও বধ করতাম।"

জেস্‌লার চীৎকার করে বলল—"ধর, ঐ দুর্বৃত্তটাকে বন্দী কর।"

টেল বন্দী হল—কিন্তু অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি তাকে বন্দী করে রাখতে পারল না। প্রহরীরা টেলকে হ্রদ পার করে নিয়ে যাচ্ছিল—পথে ভীষণ ঝড় ওঠায় নৌকো পথ হারিয়ে ফেল্‌লে তারা টেলের হাতকড়া খুলে দিতে বাধ্য হয়। প্রহরীদের ক্ষমতা ছিল না নৌকো বাঁচানোর। টেল ছাড়া সে বিপদে কে হাল ধরবে? টেল নিজে নৌকো বেয়ে নৌকো থেকে লাফিয়ে পাহাড়ের জঙ্গলের মাঝে অন্তর্হিত হল। জেস্‌লার বহু চেষ্টাতেও তাকে আর ধরতে পারে নি।



উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

এক গ্রামে উদয়চাঁদ আর বুধুইচাঁদ নামে দুই চাষী বাস করত। বলাইচাঁদ ছিল সে গ্রামের 'মোড়ল'। সকলে তাকে ফন্দীবাজ ব'লে ভয় করত, কাজেই দায়ে পড়ে খাতিরও করত।

একদিন উদয়চাঁদ (লোকে তাকে উদো বলে ডাকত) বলাইচাঁদের কাছে গিয়ে বলল,—"কর্তা আমার মাতৃ-দায় উপস্থিত। হাতে একটা পয়সা নেই। কি করি বলুন দেখি ?"

বলাই বলল—"তাতো বটে, পাঁচজনের বাড়ী খেয়ে আসিস, এখন লোক না খাওয়ালে চলবে কেন ? মাতৃশ্রাদ্ধ বলে কথা, খরচপত্র করতে হবে বইকি।"

উদো বলল—"আজ্ঞে তা' তো বটে, শক্তি যে নেই। এখন কি করি বলুন তো ? আপনি যদি কোনরূপে আমার দায় উদ্ধার করে দেন।"

তার ইচ্ছা, বলাই তাকে কিছু টাকা ধার দেয়।

বলাই বলল—"আমার হাতেও এখন টাকা নেই ; তবে তোর একটা উপায় আমি করব।"

বুধুইকে লোকে 'বুধো' বলে ডাকত। তার কিছু পয়সা আছে, আর উদোর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতাও আছে। বলাই তা আগে থেকেই জানত।

দু'জনে একসঙ্গে চাষ-আবাদ করে, একে অপরের খোঁজখবর রাখে। কিন্তু বুধো অত্যন্ত কৃপণ, কাউকে একটি পয়সাও ধার পর্যন্ত দেয় না।

পরদিন উদো আর বুধো যে জমিতে চাষ-আবাদ করছিল, বলাইচাঁদ সেই জমির কাছ দিয়ে যেতে যেতে বলল,—'উদো, তোর চাষ-আবাদ কতদূর রে ?"

উদো উত্তর দিল,—"আজ্ঞে এখনো দেরী আছে। জানেন তো আমার মাতৃদায়, নিজে খাটতে পারিনি। পয়সা খরচেরও ক্ষমতা নেই, লেখাপড়াও জানি না যে চাকরি করব। ক্ষেতেই খেটে খেতে হবে।"

বলাই বলল—"লেখাপড়া তো বুধোও জানে না"

বুধো উত্তর না দিতে দিতেই উদো বলল, 'না, বুধোও লেখাপড়া জানে না। আমার চাইতেও সে বোকা।" অমনি রাগে গরগর করে বুধো বলে উঠল, "কেন জানব না ? কাগজ থাকলে এখনই লিখে দিতাম।" বুধো নিজের নামটি লিখতে জানে, বলাই তা জানত।

বলাই অমনি বলে উঠল—"উদো, আমার চণ্ডী মণ্ডপের ঘরে দোয়াত-কলম আর ভাল একখানা কাগজ আছে, নিয়ে আয়—বুধোর কথার সত্য মিথ্যা জানা যাবে।" তখনই উদো তা নিয়ে এল। হাসতে হাসতে সরল মনে বুধো আদেশমত জায়গায় নিজের নামটি লিখে সগর্বে বললো,—"এই দেখ।"

বলাই সেই কাগজখানি নিয়ে প্রস্থান করল। তাতে লেখা হ'ল এক হ্যাণ্ডনোট। উদোকে বলাই টাকা দিল সেই হ্যাণ্ডনোটের বাবদে। উদোও সাড়ম্বরে মাতৃ-শ্রাদ্ধ করল।

তারপর সেই দলিলে স্বাক্ষর দেখিয়ে মহাজন বুধোর কাছ থেকে মায় সুদ সমেত সমস্ত টাকা আদায় করে নিল।

উদো তার মায়ের পিণ্ডি দিল খরচ করে, কিন্তু খরচ পড়ল গিয়ে বুধোর ঘাড়ে। এ থেকে প্রবাদ তৈরী হয়েছে—"উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।"

———

সরাইখানা



এক দরবেশ একদিন এক নগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশ বহু দূরপথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন—তিনি বিশ্রামের জন্য একটা আস্তানা খুঁজছিলেন। একটা বড় বাড়ী দেখে তার ফটক দিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন। দরবেশ জানতেন না, যে-গৃহে তিনি প্রবেশ করলেন—সে গৃহখানি সে দেশের সুলতানের দরবার।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, দরবার-গৃহ শূন্য। দরবেশ দরবার গৃহে প্রবেশ করে তাঁর কম্বলখানা বিছিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় প্রহরীরা এসে গর্জন করে বলল—"দরবেশ, তুমি এখানে কেন? শীঘ্র ওঠ। এটা সুলতানের দরবার গৃহ।"

দরবেশ—"না এটাতো সরাইখানা। আমি উঠ্‌ব কেন? আমি আজ রাত্রিটা এখানে কাটাব মনে করেছি।"

প্রহরী—"না না, এটা সরাইখানা নয়—সুলতানের বাড়ী। শীঘ্র ওঠ,—তোমাকে সরাইখানায় পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

দরবেশ—"আমি জানি এটা সরাইখানা। আমি উঠ্‌ব না।"

প্রহরীরা বৃথাই বোঝাতে লাগল। দরবেশ কিছুতেই নড়লেন না। প্রহরীরা তখন স্বয়ং সুলতানকেই খবর দিল। সুলতান তখন সন্ধ্যার আহার সমাপ্ত করে গানবাজনা শুনছিলেন, বিরক্ত হয়ে দরবার গৃহে এলেন।

সাধু-দরবেশের প্রতি সুলতানের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। তিনি বিনীতভাবে বললেন,—আপনি এখন উঠুন। আমার মুসাফেরখানায় আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

দরবেশ বললেন—"আমি এই সরাইখানাতেই রাত্রিটা কাটাব, জাহাঁপনা। আমার জন্য কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন নেই।"

সুলতান—"আপনি রাজবাড়ীতে সরাইখানা বলে কি ক'রে ভুল করলেন ?"

দরবেশ—"জাহাঁপনা, আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব ?"

সুলতান—"বলুন।"

দরবেশ—"আপনার আগে এবং তার আগে এ বাড়ীতে কে থাকতেন ?"

সুলতান—"আমার পিতা, তার আগে আমার পিতামহ।"

দরবেশ—"আপনার পরে এ বাড়ীতে কে থাকবেন ?"

সুলতান—"আমার পুত্র থাকবে।"

দরবেশ—"অতএব দেখুন জাহাঁপনা, যে বাড়ীতে বাসিন্দা এমন ঘন ঘন বদলায়, একজনের পর একজন অতিথি তার দলবল নিয়ে বাস করে চলে যান—সে-বাড়ী সরাইখানা ছাড়া আর কি ? আমি যে একে সরাইখানা বলে মনে করেছি তাতে ভুল কোথায় হ'ল !"

সুলতান—"আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি এখানেই থাকুন।"

সুলতান দরবেশের খানাপিনার বন্দোবস্ত করে বহু রাত্রি পর্যন্ত তাঁর উপদেশ শুনে দরবেশকে সম্মানিত করলেন।

———



দুই ভিখারী

পারস্যদেশের রাজধানীর পথে দু'জন বৃদ্ধ ভিখারী ভিক্ষে করে বেড়াত। একজনের নাম রহিম আর একজনের নাম করিম।

রহিম চীৎকার করে বলত,—"দেনেওয়ালা খোদা। খোদাতালা যাকে দেন সে-ই পায়।"

করিম চীৎকার করে বলত,—"দেনেওয়ালা সুলতান। সুলতান যাকে দেন সে-ই পায়।"

সুলতান একদিন প্রাসাদের ছাদ থেকে দু'জনের চীৎকার শুনলেন। শুনে তিনি একখানা পাঁউরুটি তৈরী করালেন এবং তার মধ্যে পঁচিশটা মোহর পুরে দিলেন। করিম রাজবাড়ীর দুয়ারে আসামাত্র রুটিখানা তার হাতে দিলেন। করিম রুটিখানা নিয়ে নিজের আস্তানায় চলে গেল। সেদিন করিম ভিক্ষে করে যথেষ্ট খাবার পেয়েছিল। করিমের সঙ্গে দেখা হলে রহিম বলল—"ভাই আজ খাবার কিছুই পাইনি; মাত্র কয়েকটা পয়সা পেয়েছি।"

করিম বলল—"তুমি এই রুটিখানা কিনতে পার। সস্তায় দেবো।"

রহিম দু'পয়সা দিয়ে সুলতানের দেওয়া রুটিখানা কিনল।

সুলতান ভেবেছিলেন—করিমকে তিনি যা দিয়েছেন তাতে সে আর ভিক্ষে করবে না, কিন্তু তিনি পরদিনই করিমের চিৎকার শুনতে পেলেন, রহিমের চীৎকার আর শুনলেন না। উপরি উপরি তিন দিন ধরে লক্ষ্য করলেন যে, রহিম আর ভিক্ষা করছে না। করিম

আগের মতই-চীৎকার করে বলছে, "সুলতানই দেনেওয়ালা, সুলতান যাকে দেন, সেই পায়।"

সুলতান করিমকে ডেকে পাঠালেন। করিম সুলতানের সামনে এলে সুলতান বললেন,—"আমি সেদিন যে রুটিখানা তোমাকে দিয়েছিলেম তা তুমি খেয়েছো?"

করিম বলল,—"হ্যাঁ খোদাবন্দ, বড়ই মিষ্টি রুটি। জনাব যাকে দেন সেইতো ভাগ্যবান।"

স্মুলতান বললেন,—"আর একজন ভিখারীকে আর ভিক্ষে করতে দেখছি না কেন? তার কি অসুখ হয়েছে?"

করিম বলল,—"খোদাবন্দ, তার কোন অসুখ হয়নি। সে বলছে যে খোদা তাকে ছপ্পর ভরে দিয়েছেন, তার আর ভিক্ষে করার প্রয়োজন নেই।"

সুলতান রহিমকে ডেকে পাঠালেন। রহিম এসে সেলাম করলে সুলতান বললেন,—"তুমি আর ভিক্ষে কর না কেন?"

রহিম বলল,—"খোদাবন্দ, আর আমার ভিক্ষে করার প্রয়োজন নেই! খোদা আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন—তাতেই আমার চলে যাবে।"

সুলতান বললেন—"তুমি অর্থ কোথায় পেলে?"

রহিম বলল,—"খোদাবন্দ, করিম আমাকে একখানা রুটি বিক্রী করেছিল। সেই রুটিখানা ভেঙ্গে পঁচিশখানা মোহর পেয়েছি। হুজুরের কাছে আমি কিছুই গোপন করব না।"

সুলতান তখন করিমকে বললেন, —"দেখ, করিম, খোদাই দেনে-ওয়ালা, খোদা যাকে দেন, সেই পায়। আমি পঁচিশখানা মোহর তোমাকে দিলাম তবু তুমি পেলে না। এখন বুঝছ—সুলতান দেনে-ওয়ালা নয়। আর আমার নাম করে চীৎকার করো না। আমি যাঁর বান্দা, সেই খোদার নাম করে ভিক্ষে করো। আর তুমি মিথ্যেবাদী, তোমাকে আমি আর কখনও ভিক্ষে দেবো না।"

———

বোধিসত্ত্বের বুদ্ধি



কোশলরাজের চূড়ামণি হারিয়েছে। যে-সে মণি নয়—সাত রাজার ধন এক মাণিক ; হয়ত সাপের মাথারই মণি হবে। অন্তঃপুরে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে, রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্বারে চতুর্গুণ প্রহরী বসে গেছে। কেউ যেন বাইরে যেতে না পারে। সমস্ত রাজবাড়ীতে খানাতল্লাসি চলছে—প্রহরীগণ সেনাপতির আদেশে প্রত্যেকের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করছে—যাকে একটু সন্দেহ হচ্ছে, তার উপরই উৎপীড়ন চলছে। দেখে ভয়ে রাণীদের মুখও শুকিয়ে গিয়েছে।

এমন সময় জেতবন থেকে আনন্দ এলেন রাণীদের ধর্মোপদেশ দেবার জন্য। রাণীরা আজ ধর্মোপদেশ শুনবে কি অন্তঃপুরের বিপদের কথা তুলে আনন্দকে বলল—

"প্রভু, আজ মহারাজের চূড়ামণি চুরি হয়ে গেছে, সেজন্য অন্তঃপুর তোলপাড় হচ্ছে। আপনি যদি কোন উপায় বার করতে পারেন তা হলে আমরা সকলে অব্যাহতি পাই। একজন কেউ চুরি করেছে, কিন্তু সেজন্য রাজার হুকুমে হাজার লোকের সাজার ব্যবস্থা, একটা গতি করুন প্রভু।"

আনন্দ একথা শুনে রাজার কাছে গিয়ে বললেন, "মহারাজ, আমি যা বলি শুনুন। এভাবে নিরীহদের ওপর উৎপীড়ন করবেন না।"

মহারাজ বললেন,—"আপনি যা বলবেন তাই করব। বলুন কি করতে হবে?"

আনন্দ —"আপনি রাজপুরীর প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে কাদার ঢেলা দিন এবং বলে দিন, কাল সকালে প্রত্যেকে এসে একটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে ঢেলাটি রেখে যাবে। যে মণি চুরি করেছে—সে তো আত্ম-প্রকাশ করতে সাহস করবে না। সে মণিটি ঐ ঢেলার মধ্যে পুরে রেখে যাবে। একদিনে না হয়—তিন দিন ধরে পরীক্ষা করুন—মণি অবশ্যই পাবেন।"

আনন্দের উপদেশ মত রাজা মাটির ঢেলা বিতরণ করলেন—রাণীদের হাতেও এক-একটি দিলেন। তিন দিন পরীক্ষা করে দেখা গেল, মণি মিলল না। মহারাজ আনন্দকে বললেন,—"প্রভু, মণি তো পাওয়া গেল না।" আনন্দ বললেন,—"মহারাজ, চোর এখনও ভাবছে কোনরূপে মণিটা হজম করা যায় কি না, এটা পাকা চোরেই নিয়েছে—আরো দু'চার দিন দেরি হবে। সে ভাবছে এখনও তা কোনরূপে আত্মসাৎ করা যায় কি না, কিন্তু ভয়ও নিশ্চয় পেয়েছে। প্রহরীদের ভয় নয়—শ্রমণ সন্ন্যাসী লোককে চোরেরা ভয় করে, ভাবে, কে জানে কোন মন্ত্রতন্ত্র হয়ত জানে, যোগবলেই হয়ত ধরে ফেলবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি যখন লেগেছি—তখন মণি বার করবই, তবে চোর ধরতে পারব না।"

মহারাজ বললেন, "চোর ধ'রে কাজ নেই—আমার মণি পেলেই হবে। মণি হারানো একটা বড় অমঙ্গলের লক্ষণ, সেজন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছি।" আনন্দ বললেন, "তবে এক কাজ করুন, আঙিনার এককোণে একটা জলের জালা রাখুন, একটা পর্দা দিয়ে ওটাকে আড়াল করে দিন। প্রত্যেকে পর্দার আড়ালে ঐ জালায় হাত ধুয়ে আসুন। রটিয়ে দিন ঐ জালার জল মন্ত্রপূত। সকাল থেকে ঐ জালাটিকে প্রাঙ্গণে রেখে পুরোহিতদের ডেকে হোমযাগ করিয়ে তান্ত্রিক-

অনুষ্ঠানের অভিনয় করুন—জালাটির চারপাশে প্রদক্ষিণ ক'রে কতক-গুলো মন্ত্রপাঠের অভিনয়ও করতে হবে।”

আনন্দের কথামত ব্যবস্থা হ'ল—প্রত্যেককে জালার জলে হাত ডুবিয়ে হাত ধুতে হল।

তারপর সন্ধ্যাকালে জালার জলে মণিটি পাওয়া গেল। আনন্দের বুদ্ধিবলে মণি পাওয়া গিয়াছে শুনে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুসভায় বললেন,—'পূর্বজন্মে আমি কিরূপে চোর ধরেছিলাম তার গল্প বলি শোন।'

পূর্বজন্মে বারাণসীর ব্রহ্মদত্তের আমি প্রধান অমাত্য ছিলাম। ব্রহ্মদত্তের রাণীরা একবার উদ্যানে জলকেলি করতে গিয়েছিলেন—কেবল, একজন দাসী সঙ্গে ছিল। বাগানের মধ্যে কোন পুরুষ মালী কিংবা ভৃত্যকে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না—রাণীরা তাদের অলঙ্কার পত্র সরোবরের তীরে রেখে জলে নেমে সন্তরণে রত হল। দাসীটি অলঙ্কারাদি পাহারা দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকাতে দাসীর তন্দ্রা এল। এমন সময়ে গাছের ডাল থেকে একটি বানরী নেমে এসে মহিষীর মণিমালাটি নিয়ে পালিয়ে গেল, দাসী জানতেও পারল না। হঠাৎ দাসীর তন্দ্রা টুটে গেল। 'চোরে রাণীর হার চুরি করেছে' বলে সে চীৎকার করে উঠল। রাণীরা তাড়াতাড়ি তীরে উঠে পড়ল। প্রমোদোদ্যানের প্রহরীরা চারিদিকে চোর খুঁজতে ছুটল—উদ্যানের পাশের রাস্তাতে একজন পথিককে পেয়ে তাকেই ধরল।

পথিক ভেবে দেখল যে, আমি কিছু জানি না বললে তো এরা আমাকে ছেড়ে দেবে না—উপরন্তু মারপিট করবে, তাড়াতাড়ি সে বলে বস্‌ল—'আমি হার নিয়েছি, ধনপতি শ্রেষ্ঠী আমাকে চুরি ক'রে তাঁকে তা দিতে বলেছিল—তাঁকেই দিয়েছি'—

প্রহরীরা ধনপতি শ্রেষ্ঠীকে ধরল. ধনপতি ভাবল এত বড় মন্দ নয়! কোথায় বা হার, কোথায় বা কি? রাজপুরোহিতের উপর ছিল তার রাগ, সে বলে বসল,—“হার আমি পেয়েছি. তবে চোরাইমাল

কিনা জানি না, ঐ লোকটা আমার কাছে শতমুদ্রায় বিক্রি করেছে, রাজপুরোহিত উপস্থিত ছিলেন—আমি তাঁকেই সেটা উপহার দিয়েছি।"

প্রহরীগণ পথিক ও শ্রেষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুরোহিতের কাছে গেল। রাজপুরোহিত ভেবেচিন্তে বললেন,—"আমি সে হার রাজগায়নকে দিয়েছি।"

রাজগায়ন বলল,—"সে হার আমি এখনি রাজ-অমাত্যের হাতে দিয়ে এলাম।"

রাজ-অমাত্য বললেন যে, "ব্যাপারটা তো মন্দ হয়নি দেখছি, মহারাজ। আমাকে তবে এখন বলতে হয় যে সে হার আপনার হাতে এখনই দিলাম এবং আপনাকে আত্মরক্ষার জন্য বলতে হয় যে মহিষীকে আমি সে হার দিয়ে এসেছি। এদের সব ছেড়ে দিন মহারাজ। এরা কেউ হারের খবর জানেন না—আমার কাছেও রাজগায়ন কোন হার দেন নি। তবে হার বার করে দিচ্ছি।"

বোধিসত্ত্ব প্রহরীদের ডেকে বললেন,—"তোমরা রাজোদ্যানের তোরণে পাহারা দিচ্ছিলে—তবে বাইরের পথিককে উদ্যানে ঢুকতে দিলে কেন?"

প্রহরীরা বলল,—"ধর্মাবতার, আমরা কাউকে ঢুকতে দিই নি।"

বোধিসত্ত্ব—"রাজোদ্যানের প্রাচীর টপকাতে হ'লে যে মই বা কাঠের সিঁড়ির দরকার তা কি পথিকের সঙ্গে ছিল?"

প্রহরীগণ,—"না, কিছুই তার সঙ্গে ছিল না।"

বোধিসত্ত্ব—"উদ্যানের মধ্যে কেউ কি লুকিয়ে ছিল বলে মনে হয়?"

প্রহরীগণ—"কেউ লুকিয়ে ছিল না।"

বোধিসত্ত্ব—"পথিকটা হারটা চুরি ক'রে একক্রোশ দূরে বাজারে গিয়ে শ্রেষ্ঠীকে হার দিয়ে আবার বাগানের পাশে ফিরে এলো—"এও কি সম্ভব?"

প্রহরীগণ—"না। তা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।"

বোধিসত্ত্ব—"তবে মিছামিছি এদের ধরে আনলে কেন? আমার বিশ্বাস তোমরাই চুরি করেছ।"

প্রহরীগণ—"না, ধর্মাবতার আমরা কিছুই জানি না।"

বোধিসত্ত্ব—"যাও, বাগানের মধ্যেই তবে খোঁজ কর গিয়ে, কোন জীবজন্তুও তো চুরি ক'রে কোথাও ফেলতে পারে।"

প্রহরীরা সমস্ত বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল, কোথাও হার পেল না। বোধিসত্ত্ব বানরগুলোকেই সন্দেহ করলেন। তিনি বানরের বৃত্তি-প্রবৃত্তি জানতেন। নকল মুক্তার দুগাছি হার তৈরী করিয়ে তিনি দুটি বানরের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর অন্যান্য বানরগণকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একটি বানরীর গলায় মহিষীর মণি-হারটি দুলছে। অন্য দুটি বানরের গলায় হার দেখে হারচোর বানরীটি চুরিকরা হারটি খুঁজে বার করে গলায় পরেছে। তারপর সে উল্লাসে মেতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফালাফি করে বেড়াতে লাগল।

মহারাজ স্বয়ং বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ছিলেন! বোধিসত্ত্ব বানরীটিকে দেখিয়ে মহারাজকে বললেন,—"মহারাজ আপনি ঐ বানরীটিকে মনিহার উপহার দিয়ে শেষে দেশশুদ্ধ লোককে চোর বলে ধরছেন।"



বন্ধু নির্ব্বাচন

এক মৃগের সঙ্গে এক কাকের ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। দুজনে দিনের বেলায় আহার সংগ্রহে বের হত—সন্ধ্যায় একত্র হত। একটা বকুল গাছের তলায় মৃগটি শুয়ে থাকত, কাক গাছের ডালে থেকে পাহারা দিত। এতে মৃগটির কোনরকম কোন বিপদ ঘটেনি।

মৃগটি বেশ স্বচ্ছন্দে চরে বেড়িয়ে মোটাসোটা হয়ে উঠল। তাকে দেখে এক শেয়ালের বড়ই লোভ হল। শেয়াল ভাবতে লাগল কি করে তার মাংস খাবে। শেয়াল ক্রমে হরিণের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল। সরল-চিত্ত হরিণ শেয়ালকে বন্ধু মনে করে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াত লাগল। একদিন কাকের চোখেও তা পড়ল।

কাক উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"বন্ধু, ওর সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ কেন? শেয়াল খুব ধূর্ত জীব। ওরা মাংস খেতে ভালবাসে। কোন দিন তোমাকে বিপদে ফেলবে। হয়ত কোন বৃকের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।"

হরিণ বলল—"বন্ধু, তুমি অন্যায় সন্দেহ করছ। এই শেয়ালটি সে-প্রকৃতির জানোয়ার নয়। এই শেয়াল বড়ই সদাশয় ও ভদ্র। এর আচরণ বড়ই ভালো; তুমি একে জান না। জানলে এমন কথা বলতে না। একমাত্র বন্ধুর ওপর নির্ভর করা উচিত নয়—বন্ধুর

সংখ্যা বাড়ানো উচিত। আজ তুমি বন্ধু আছ—কাল তুমি বিরূপ হতে পার, তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে। নতুন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি বলে কি তোমার হিংসে হচ্ছে। শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও তোমার ওপর আমার ভালবাসা কিছুমাত্র কমবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।”

কাক বলল,—“আমি সে চিন্তা করছি না বন্ধু! যার কুল-শীল জানা নেই—তার সঙ্গে মেলামেশা কি ভালো?”

হরিণ বলল,—“বন্ধু, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম আলাপ হয়, তোমার কুল-শীল সেদিন কিছুই জানতাম না। প্রথমে কারও কুল-শীল জানা থাকে না।”

কাক বলল,—“যাই হোক তুমি সাবধানে থাক্‌বে।”

এদিকে শেয়াল একদিন হরিণকে বলল,—“এখান থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষেত দেখলাম, সেখানে টিয়াপাখীর পাখার মতন যবের চারা হয়েছে। চল, আমি তোমাকে সেই ক্ষেত দেখাচ্ছি।”

শেয়ালের কথাতে হরিণ রাজী হয়ে ক্ষেতে যব খেতে গেল। ক্ষেতের মালিক ক্ষেতে জাল পেতে রেখেছিল। হরিণ জালে বাঁধা পড়ল। তখন সন্ধ্যাকাল। হরিণ বিপন্ন হয়ে শেয়ালকে ডেকে বলল,—“আমি জালে বাঁধা পড়েছি—তুমি দাঁত দিয়ে জাল কেটে আমাকে উদ্ধার কর।”

শেয়াল বলল,—“জালের দড়ি পশুর নাড়ী দিয়ে তৈরী, আমি রবিবারে তা স্পর্শ করতে পারি না—সকালে ব্যবস্থা করব। তুমি নিশ্চিত থাক, আমি বেড়ার ধারেই অপেক্ষা করছি।”

এদিকে কাক বকুল গাছে গিয়ে দেখল হরিণ নেই। সে ভয় পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে যবক্ষেতে হরিণকে দেখতে পেল। হরিণ কেঁদে উঠে বলল,—“বন্ধু তোমার কথা না শুনে ধূর্ত শেয়ালের পাল্লায় পড়ে আমার এ দশা হয়েছে—এখন আমাকে বাঁচাও।”

কাক বলল,—“বন্ধু, শেয়াল ভাবছে, চাষীরা তোমাকে মেরে রেখে

গৃহে চলে যাবে—তখন সে মনের সুখে মাংস খাবে। তুমি এক কাজ কর, সকালবেলায় তুমি পেট ফুলিয়ে মড়ার মত পড়ে থাক্‌বে, আমি কা কা ক'রে সঙ্কেত করা মাত্র উঠে পালাবে।"

সকালে চাষী এসে দেখল, একটা হরিণ জালে জড়িয়ে মরে পড়ে আছে—একটা কাক তার চোখ ঠোকরাচ্ছে। চাষী জাল ছাড়িয়ে ক্ষেতের কাজ করতে লাগল। অমনি কাক কা-কা করে উঠল। হরিণ সঙ্কেত মত উঠে পালাল।

চাষী তার হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল—হরিণের গায়ে গিয়ে তা লাগল না, বেড়ার ধারে শেয়াল লুকিয়ে ছিল; তার গায়ে লাগল। সেই আঘাতে শেয়ালের মাথা ভেঙে গেল। কাকের কৌশলে শেয়ালের দণ্ড হল—হরিণও বাঁচল। শেয়াল ধূর্ত, কিন্তু সে জানত না, কাক তার চেয়ে আরও ধূর্ত।



কাজীর বিচার

আমাদের দেশে গিয়াসুদ্দিন নামে একজন সদাশয় সুলতান ছিলেন। তিনি একদিন তাঁর ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছিলেন। হঠাৎ একটি তীর অন্যদিকে ছুটে গিয়ে এক দুঃখিনী বিধবার পুত্রের গায়ে লাগল—তাতে ছেলেটি আহত হল।

কাজী সোরাবউদ্দিনের আদালতে গিয়ে বিধবা নালিশ করল। কাজী মহাবিপদে পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন,—"যদি সুলতানকে আদালতে তলব দিই—তাহলে চাকরি যাবে। আর যদি ন্যায়বিচার না করি, তবে ঈশ্বরের দরবারে আমার কি বিচার হবে ? আমাকে যে নরকে যেতে হবে !"

ধর্মভীরু কাজী সুলতানকে আদালতে ডেকে আনবার জন্য একজন আমলাকে হুকুম দিলেন। আমলাটি তখন বড় বিপদে পড়ল। সরাসরি রাজ দরবারে গিয়ে সুলতানকে কাজীর হুকুম জানাতে তার সাহস হল না। সে এক মতলব আঁটল। মসজিদের একটি মিনারের উপরে উঠে অসময়ে নামাজের জন্য আজান দিতে লাগল। সুলতান অসময়ে আজান শুনে তাকে ধরে আনবার জন্য প্রহরীদের আদেশ দিলেন।

দরবারে ধরে নিয়ে এলে লোকটি বলল,—"জাহাঁপনা, কাজী সোরাবউদ্দিন জনাবকে আদালতে তলব করেছেন। একথা জনাবকে জানাবার অন্য কোন ফিকির খুঁজে না পেয়ে অসময়ে আজান দিতে শুরু করেছিলাম।"

আমলাটিকে বিদায় দিয়ে সুলতান তখনই কাজীর আদালতে গেলেন। যাবার সময় জামার ভেতরে ছোট একটা তলোয়ার লুকিয়ে সঙ্গে নিলেন।

সুলতান আদালতে উপস্থিত হ'লে কাজী তাঁকে কোন প্রকার সম্মান না দেখিয়ে বললেন,—"তুমি অসাবধানে তীর ছুঁড়ে এই বিধবার পুত্রটিকে সাংঘাতিক আহত করেছ, তুমি যদি একে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে তুষ্ট না কর তাহলে দেশের আইন অনুসারে তোমার সাজা হবে।"

সুলতান কাজীকে সেলাম করে বিধবার কাছে গেলেন এবং তাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়ে তুষ্ট করলেন ও তার আহত পুত্রের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার সমস্ত ভার গ্রহণ করলেন। তারপর কাজীকে বললেন,— "জাহাঁপনা, বিধবা আমাকে মাফ করেছেন।"

বিধবাও সম্মতি জানালে কাজী আসন থেকে নেমে এসে সুলতানকে এবার যথোচিত সম্মান দেখালেন। সুলতান তখন জামার ভেতর থেকে তলোয়ারখানি বার করে বললেন,—

"কাজী, তোমার হুকুম মত আমি তোমার আদালতে হাজির হয়েছি। তোমার হাতে এই দেশের বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি আমার ভয়ে সুবিচার না করতে, তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম। বড়ই সুখের বিষয়, তুমি তোমরা কাজ ঠিকমত করেছ। তোমার মত ন্যায়নিষ্ঠ কাজী পেয়ে আমি ধন্য।"

কাজী তখন আসনের পাশ থেকে একটি চাবুক হাতে তুলে নিয়ে বললেন,—"আর খোদাবন্দ, আমিও খোদার নামে শপথ করে বলছি, আপনি যদি পবিত্র কোরাণের বিধান না মানতেন, আইনের সম্মান রক্ষা না করতেন, তাহলে এই চাবুক আপনার পিঠে পড়ত। যাক্— ভালোয় ভালোয় মিটে গিয়েছে।"

সুলতান খুশী হয়ে কাজীকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।



অর্দ্ধেক প্রাপ্য

বীরভূম জেলার এক জমিদারপুত্রের বিবাহ। জমিদারবাবু কন্যার বাড়ীতে হলুদের ডালা পাঠাবেন, তাঁর ইচ্ছা তিনি একটা প্রকাণ্ড মাছ তত্ত্বের সঙ্গে পাঠান। মাছ তিনি যথেষ্টই পেয়েছেন—কিন্তু সবই ছোট ছোট, সে রকম মাছ দশমণ পাঠালেও জমিদারের সম্মান রক্ষা হয় না। পাঁচখানা গ্রামের জেলেদের বলে দেওয়া হয়েছে—আধমণ ওজনের একটা মাছ এনে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

"অধিবাসের ডালা" পাঠাতে আর এক ঘণ্টা মাত্র দেরী আছে, এমন সময়ে একজন জেলে ত্রিশ সের ওজনের এক মস্ত রুই মাছ নিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। জমিদারবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বসেছিলেন—মাছটি দেখে উল্লাসের অবধি থাকল না। বাড়ীর মধ্যে একটা কোলাহল পড়ে গেল। গুরুর আদরে জেলেকে আপ্যায়িত করা হল।

ঘটা করে 'অধিবাসের ডালা' চলে গেল। বিকাল বেলায় জেলে বিদায় নেবার জন্য হুজুরের বৈঠকখানায় হাজির হল। জমিদার

বললেন—"নবীন, তুমি আজ আমার মুখ রক্ষা করেছ, তোমাকে আমি যথোচিত পুরস্কার দেব। এখন মাছের দামটা কত বল দেখি?"

নবীন—হুজুর, চল্লিশ বেত মাছটার দাম।

জমিদার—কি বললে চল্লিশ টাকা? দামটা একটু বেশিই হল। তা হোক—তুমি মাছটা এনে রামজীবনপুরের বাড়ীর ইজ্জৎ রক্ষা করেছ। চল্লিশ টাকাই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে।

নবীন—"না হুজুর টাকা নয়, চল্লিশ বেত আমার পিঠে।"

জমিদার—"নবীন, তুমি পাগল হয়েছ, না মাতাল হয়েছ? কি বলছ?"

নবীন–"হুজুর, পাগল আমি হইনি। পাগলে কি এতবড় একটা মাছ যোগাড় ক'রে আনতে পারে? মাতালও হইনি—আপনার বাড়িতেই সারাদিন আছি। চল্লিশ বেতই মাছটার দাম।"

জমিদার—"নবীন, পাগলামি করো না। আমার আজ অনেক কাজ; তাড়াতাড়ি মাছের দামটা মিটিয়ে দিয়ে অন্য কাজে যেতে হবে।"

নবীন—"হুজুর, আমার ঐ এক কথা।"

জমিদার—"ভাল পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে; ও নরেন, একে চল্লিশটা টাকা দিয়ে দাও।"

নবীন—"না হুজুর, আমি টাকা কিছুতেই নেব না, বেত-ই চাই।"

জমিদারবাবু মহাবিপন্ন হয়ে পড়লেন। জমিদারবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন বলল, "কাকাবাবু এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। আস্তে আস্তে চল্লিশ বেত ওকে দেওয়া যাক, তারপরে কি বলে দেখা যাবে।"

জমিদারের খানসামা বেত নিয়ে জেলের পিঠে আস্তে আস্তে কুড়ি বার যেমন মেরেছে, অমনি জেলে বলে উঠল—"থামুন বাবু,

থামুন। আমার একজন ভাগীদার আছে, বাকী কুড়ি বেত তার পাওনা। তাকে ডাকতে পাঠান।"

নরেন—"সে আবার কে?"

নবীন—"আপনাদের দারোয়ান। মাছটা নিয়ে যখন দেউড়িতে ঢুকতে গেলাম, দারোয়ানজী বাধা দিয়ে বল্ল—আমায় কি দিবি বল্, নইলে ঢুকতে দেব না। আমি তাকে ব'লে এসেছি যা পাব তার অর্ধেক দেব।"

তখন সকলেই রহস্যটা বুঝলেন। দারোয়ানকে ডেকে পাঠানো হ'ল। তাকেও কুড়ি ঘা বেত দেওয়া হ'ল। জেলে অনুরোধ করল —"হুজুর দারোয়ানজীর প্রাপ্য অর্ধেক, আমাকে যেভাবে বেত মারা হয়েছে, ওকেও ঠিক যেন সেই ভাবেই মারা হয়—নইলে আধা-আধি ভাগ ঠিক হবে না।"

দারোয়ানের বেতে ততটা দণ্ড হল না বটে—তবে তার চাকরি গেল। জমিদার নবীনকে বললেন, "তোমার দাম তো দেওয়া হয়েছে, এবার পুরস্কার দিলাম পঞ্চাশ টাকা।"

নবীন বলল,—"এরও অর্দ্ধেক দারোয়ানের প্রাপ্য। বেচারার চাকরি গেল। পঁচিশ টাকা আমি ওকে দিচ্চি। হুজুর আমার কিছুই লোকসান হ'ল না—মাছটির দাম পঁচিশ টাকার বেশী নয়।"

জমিদার শুধু বললেন,—"গরীব লোক, কিন্তু অদ্ভুত লোক এই নবীন।"



বৃক্ষের সাক্ষ্য

এক গ্রামে বেচারাম ও কেনারাম নামে দুই বন্ধু বাস করত। তাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অগাধ বিশ্বাস,—কখনও কোন অবিশ্বাসের কারণ ঘটে নি।

একবার বেচারাম তীর্থভ্রমণে যাবার সময়ে বন্ধু কেনারামের কাছে কতকগুলি সোনার গহনা রেখে গেল। বাড়ীর কাছে একটা পুকুরে ধারে একটি বটগাছতলায় বসে বেচারাম গহনার বাক্সটা খুলে কি কি গহনা থাকল, কেনারামকে দেখিয়ে একটা তালিকা করে বাক্সের মধ্যে রাখল—আর একটা তালিকা নিজে সঙ্গে নিল। কেনারাম বলল,—"আমি একটি রসিদ দিই তবে? বাড়ীর মধ্যে থেকে দোয়াত কলম নিয়ে আসি।"

বেচারাম বলল—'পাগল নাকি। তোমার কাছ থেকে আবার কি রসিদ নেব? রসিদ আবার কি হবে?"

কেনারাম আর পীড়াপীড়ি করল না, একবার পকেটে হাত দিল, যদি পেনসিল একটা পাওয়া যায়।

বেচারাম তীর্থভ্রমণ শেষ করে বাড়ী ফিরে কেনারামের কাছে গহনার বাক্সটি চাইল।

কেনারাম বলল,—“গহনার বাক্স। সে আবার কি? গহনার বাক্স আমার কাছে কবে আবার রাখলে? গাঁজা খেয়েছ নাকি? না, তীর্থে গিয়ে তোমার মতিভ্রম হয়েছে। বাহাত্তর হতে তো এখনও ঢের বাকি।”

বেচারাম আকাশ থেকে পড়ল, বলল—“বল কি বন্ধু? তোমার কাছে যাবার আগের দিন সন্ধ্যার সময় ঐ বটতলায় গহনার বাক্স দিয়ে গেলাম। কি কি গহনা থাকল—তার এই তালিকা আমার কাছে রয়েছে। না, তুমি ঠাট্টা করছ; যাও আর ঠাট্টা করতে হবে না। আন দেখি।”

কেনারাম—“কি আবোল তাবোল বকছ? গহনার বাক্স নিয়ে আবার কেউ ঠাট্টা করে? গহনার বাক্স তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছ—এখন বিলকুল ভুলে গেছ। তুমি রাখতে চেয়েছিলে বটে, আমি বললাম, “না ভাই, এত টাকার জিনিস আমি রাখতে পারব না। বড় দায়িত্ব।” তুমি বললে, “শ্বশুরবাড়ীতেই রেখে আসি তবে, কেমন? এখন মনে পড়ছে তো?”

বেচারাম “এত বড় শঠতা? তুমি একজন এত বড় জোচ্চোর তা কখনও জানতাম না। তুমি বন্ধু হয়ে আমাকে পথে বসালে? আচ্ছা, আদালত আছে, দেখে নেব।”

কেনারাম—“তা নিও। একবার আদালতে গিয়ে দেখ না, তোমাকে পাগলাগারদে পুরবে। না আছে সাক্ষী, না আছে রসিদ। ভয় দেখাচ্ছ? দেখাও তোমার রসিদ কিংবা যে কোন কাগজ, আমি এখনি যে রকম করে পারি বাক্স এনে দেব।”

বেচারাম আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করল। হাকিম দুজনকেই তলব করলেন। কেনারাম মুচকি হাসছে। বেচারামের মুখ বিষণ্ণ—হাকিম কি বিচার করবেন কে জানে?

হাকিম বললেন,—“আচ্ছা বেচারাম, তোমার কাছে কোন রসিদ বা এক টুকরো কাগজে সামান্য কিছু লেখাও কি নেই?”

বেচারাম—"হুজুর, গহনার তালিকাটা আছে !"

হাকিম—"কোন সাক্ষীও কি সেখানে ছিল না ?"

বেচারাম—"আজ্ঞে না, সন্ধ্যার সময়ে একটা বটগাছ তলায় বাক্সটা রাখতে দিয়েছিলাম।"

হাকিম—"বটগাছটাই তোমার একমাত্র সাক্ষী, কি বল ?"

সকলে হাসতে লাগল, কেনারামও তাতে যোগ দিল।

হাকিম—"তবে বেচারাম, সেই বটগাছটাকেই ডাক।"

আদালতে আবার হাসির রোল উঠল, কেনারামের হাসি আর ধরে না।

হাকিম—"আমি বলছি, সে আসবে। আমার নাম করে ডাকবে। এ মুলুকের গাছগুলোও আমার কথা শোনে। যদি নাও আসে গাছের ভিতর থেকে কথা শুনতে পাবে। ফিরে এসে গাছ কি বলে, জানাবে।"

হাকিমের হুকুমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেচারাম উঠল এবং আস্তে আস্তে হতাশ হয়ে বাড়ীর দিকেই চলল।

আধঘন্টা কেটে গেল। বেচারাম ফিরে এল না। হাকিম বললেন, "লোকটা এখনও ফিরল না কেন ? আবার একটু বাদে কেনারামের পানে চেয়ে বললেন—"এখনও ফিরল না কেন ? স'রে পড়ল না কি ?

কেনারাম হঠাৎ বলে উঠল,—"আজ্ঞে সে গাছ এখান থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। ফিরবার সময় হয়নি।"

হাকিম একজন পিয়াদাকে বললেন,—"ঐ লোকটাকে গ্রেপ্তার কর। আর বেচারামকে ফিরিয়ে নিয়ে এস !"

হাকিম বললেন—"শয়তান ! যে গাছ-তলায় গহনার বাক্স নিয়েছিলে সে গাছটা চেন, আর গহনার বাক্সটার কথা জান না ?"

কেনারাম কেঁদে ফেলল। হাত জোড় করে বলল, "হুজুর, মাফ করুন। ছেড়ে দিন, আমি এখনি বেচারামকে গহনার বাক্স ফেরত দিচ্ছি। বুঝলাম—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।"

বলা বাহুল্য, হাকিম কেনারামকে ছাড়লেন না।

বারোয়ারী বুদ্ধি



এক সময় একজন রজক একটা মোটাসোটা গাধা কিনে বাজার থেকে ফিরছিল। গাধাটি আগে আগে চলেছে, রজক ও তার পুত্র পিছন পিছন চলছে। শহরের মধ্য দিয়ে আসবার সময় কয়েকটি বালিকার সঙ্গে তাদের দেখা হল। বালিকারা হাসাহাসি করছিল ও রজকের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলছিল। রজক শুনতে পেল না; তার পুত্র কিন্তু শুনতে পেয়ে বলল,—“বাবা মেয়েগুলো কি বলছে শুনেছ? বলছে লোকটা এমনই বোকা যে, গাধাটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর দুজনে পিছু হেঁটে চলেছে।”

এই কথা শুনে রজক ভাবল যে সত্যিই তো ওরা ঠিকই তো বলেছে। তখন গাধার পিঠে ছেলেকে চাপিয়ে সে পিছু পিছু হেঁটে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা একটা দোকানের সামনে কিছু খাবার কিনবার জন্য দাঁড়াল। দোকানের দাওয়ায় কতকগুলো অলস লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল, তারা বলাবলি করতে লাগল, “এরা কি অদ্ভুত লোক, ছেলেটা চড়েছে গাধার পিঠে, আর বুড়ো চলেছে হেঁটে। ছেলেটাও নির্লজ্জ, লোকটাও তেমনি নির্বোধ।”

রজক এই মন্তব্য শুনে ভাবল যে, ওরা ঠিকই তো বলছে। তখন সে নিজে গাধার পিঠে চড়ে বসল; ছেলেটি পিছু পিছু ছুটতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর রজক দেখল কতকগুলো স্ত্রীলোক

হাসাহাসি করছে। তারা কি বলছে শুনবার জন্য গাধাটিকে থামাল। তারা বলছিল—"নির্লজ্জ বুড়ো তুমি গাধার পিঠে বসে দিব্যি আরামে চলেছ, আর কচি ছেলেটাকে পিছু পিছু ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ? এমন নিষ্ঠুর বাপ কখনও দেখিনি!"

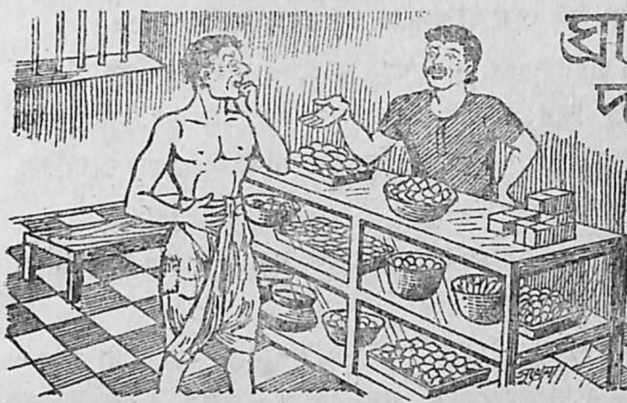
এই কথা শুনে রজক ভাবল যে, সত্যিই তো, এরা ত ঠিকই বলেছে। তখন সে তার ছেলেকে পিছনে গাধার পিঠে চড়িয়ে নিল। কিছুদূর যেতে না যেতে আবার রজক শুনতে পেল যে, একজন লোক আর একজন লোককে বলছে—"এই বুড়োটা কি পাষণ্ড! একটা দুর্বল গাধার পিঠে দু'জনে চড়েছে, ক্ষুদ্র জীবের প্রতি কোন দয়ামায়া নেই। এদের পুলিশে দেওয়াই উচিত। দু'জনে গাধাটার উপর না চড়ে এদের উচিত গাধাটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া।"

রজক এই মন্তব্য শুনে গাধার পিঠ থেকে নিজে নামল, ছেলেটাকেও তাড়াতাড়ি নামাল। তারপর গাধাটাকে শুইয়ে তার চার পা দড়াদড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল এবং লম্বা লাঠি দুগাছি দিয়ে বাব বেটায় গাধাটিকে ঘাড়ে তুলল। সেইভাবে বহন করে তারা নগরের বাইরে চলে এল। এই অপরূপ দৃশ্য দেখে নগর থেকে ছেলের দল পিছু নিল। তারা হাততালি দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল—"গাধার গঙ্গাযাত্রা কে দেখবে এস।"

ততক্ষণে রজক গাধা নিয়ে একটা সাঁকোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। সাঁকোর তলা দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে—রজক যেমন ঠিক সাঁকোর উপর উঠেছে, অমনি গাধাটা চীৎকার ও কোলাহলে ভয় পেয়ে দড়াদড়ি ছিঁড়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রজক ও রজকপুত্র ছিটকে অনেক দূরে পড়ে গেল। গাধাটা জলে ভেসে গেল। রজক তখন কপালে করাঘাত করে বলতে লাগল—

নিজের বুদ্ধি ক্ষুদ্র হ'লেও তাহাই ছিল ভালো,
বারোয়ারী বুদ্ধিতে মোর সকলি ফুরালো॥

ঘ্রাণের দাম



অনেকদিন আগে এক গ্রামের একজন চাষী গ্রামের একটি খাবারের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় খাবারের দোকানের মালিক তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি দেখছ? চাষী উত্তর দিলে—না—কিছু না। দোকানের খাবারগুলো দেখছিলাম।

মালিক বলল, দেখছিলাম মানে? তুমি আমার দোকানের সমস্ত খাবারের ঘ্রাণ নিয়েছ। তোমাকে খাবারের অর্দ্ধেক দাম দিতে হবে। চাষী বেচারী তো অবাক! খাবারের দাম দেব কেন? আমি তো তোমার দোকানের ভেতরে শুধু ঢুকেছি, তুমি মিছামিছি আমার কাছে দাম চাইছ কেন? তোমরা ধনীরা শুধু গরীবদের উপর অত্যাচার কর। এটা ঠিক নয়—যাই বলো। আমি তোমার দোকানের খাবার খাইনি; তাই দাম দেবার কোন প্রশ্নই উঠে না; এই বলে গরীব চাষী নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল।

খাবারের দোকানদারের সাথে সেই গ্রামের বিচারকের খুব জানা শোনা ছিল। সে চাষীর বিরুদ্ধে বিচারকের কাছ নালিশ জানাল। বিচারক পেয়াদা দিয়ে চাষীকে তার কাছে হাজির হ'তে বলল।

চাষী বেচারী বিপদে পড়ে সেই গ্রামের মধু নামে একজন চালাক লোকের শরণাপন্ন হ'ল। তার কাছে কেঁদে সমস্ত ঘটনা খুলে ব'লল।

মধু ব'লল, তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমার সাথে বিচারকের কাছে যাব এবং যা বলবার ও করবার আমিই ক'রব।

যথাসময়ে চাষীকে সঙ্গে নিয়ে মধু বিচারকের সামনে হাজির হ'ল।

দোকানদার তার আগেই সেখানে হাজির ছিল এবং বিচারকের সঙ্গে খুশী মনে খুব গল্প করছিল। বিচারক চাষীকে দেখে রাগান্বিত হ'লে গালি দিয়ে বললেন,—

"নির্লজ্জ! তুমি দোকানদারের দোকানের খাবারের ঘ্রাণ নিয়ে দাম দাওনি কেন? এক্ষুনি পয়সা দিয়ে দাও।"

"হুজুর ও হচ্ছে মূর্খ চাষা ও কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে?" এই ব'লে মধু এগিয়ে এসে ব'লল—"হুজুর, দু'দিন সময় দিন, আপনার সামনেই ও দোকানদারের পাওনা মিটিয়ে দেবে।"

বিচারক। বেশ, তাহ'লে তোমার কথায় ও-কে দু-দিন সময় দিলাম। কিন্তু ও যদি সময় মতো পয়সা না দেয়, তার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।

নমস্কার করে মধু এবং গরীব চাষী বিচারকের দরবার থেকে বেরিয়ে এল।

চাষী মধুকে ব'লল, "ভাই তুমি তো দু-দিন সময় নিয়ে ব'ললে পয়সা দেবে। কিন্তু আমি তো দু'বছরেও পয়সা যোগাড় করতে পারবো না।"

মধু ব'লল,—"সেজন্য তোমাকে চিন্তা ক'রতে হবে না। যা করবার আমিই ক'রব।"

চাষীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লল—"আমাদের মতো গরীব লোকদের বেঁচে থাকাই মুশ্‌কিল।"

দু-দিন পর মধু এবং চাষী সময় মতো বিচারকের সামনে হাজির হলো।

বিচারক—কই হে মধু? পয়সা এনেছ তো?

হ্যাঁ, হুজুর। মধু বিনীতভাবে উত্তর দিল।

বিচারক। তবে আর দেরী করছ কেন? দোকানদারকে পয়সা দিয়ে দাও—

মধু তখন কোমর থেকে তামার পয়সা ভর্তি একটি থলে বের করে দোকানদারের সামনে হাজির হ'ল। দোকানদার খুশী মনে পয়সার থলেটা নিতে গেল।

মধু ব'লল—"একটু দাঁড়ান হুজুর।"

এই ব'লে পয়সার থলিটা দোকানদারের কানের কাছে নিয়ে নাড়তে লাগল।

হুজুর, আপনি কি এই থলির মধ্যে পয়সার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?

দোকানদার—হাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

ব্যস, তা'হলে মিটে গেল। এই লোকটি আপনার দোকানের খাবারের ঘ্রাণ নিয়েছিল, আর আপনি আমার থলির পয়সার আওয়াজ শুনলেন! হিসাব মিটে গেল।

বিচারক। "এটা কি ধরনের রসিকতা?"

মধু। "হুজুর ঘ্রাণ নিলে যদি খাবার খাওয়া হয়, তবে পয়সার আওয়াজ শুনলে পয়সা নেওয়া হবে না কেন? আপনিই বিচার করুন"

বিচারক এবং দোকানদার দুজনেই চুপ করে রইল।

মধু চাষী হাত ধরে হাসতে হাসতে বাইরে চ'লে গেল।